একবিংশ শতকে বাংলা সাহিত্যে নূতন ভুবন : দলিত আত্মজীবনী

[New Horizons in 21st Century Bengali Literature: Dalit Autobiography]

Dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of the degree of Master of Philosophy of Jadavpur University.

By

ALI HOSSAIN

School of Languages and Linguistics

Jadavpur University

Kolkata

700032

May, 2019

Declaration

15/05/2019

This thesis, titled, একবিংশ শতকে বাংলা সাহিত্যে নূতন ভুবন : দলিত আত্মজীবনী, [New Horizons in 21st Century Bengali Literature : Dalit Autobiography] submitted by me for the award of the degree of the Master of Philosophy, is an original work and has not been submitted so far in part or in full for any other degree or diploma of any University or Institute.

Ali Hossain.

ALI HOSSAIN

M. Phil Student in 2017 – 2019

Examination Roll No: MPLI194006

Registration No: 124580 of 2013-14

School of Languages and Linguistics

Jadavpur University

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়
কলকাতা - ৭০০ ০৩২, ভারত

*JADAVPUR UNIVERSITY
KOLKATA-700 032, INDIA

SCHOOL OF LANGUAGES AND LINGUISTICS

Certificate

This is to certify that the dissertation entitled **একবিংশ শতকে বাংলা সাহিত্যে নূতন ভুবন: দলিত আত্মজীবনী (New Horizons in 21st Century Bengali Literature: Dalit Autobiography)** being submitted by **Ali Hossain** for Master of Philosophy degree in School of Languages and Linguistics, Jadavpur University has been written under my supervision during the session 2018-2019. This work has not been submitted elsewhere for degree.

14/05/19

Dean
Faculty of Interdisciplinary Studies,
Law and Management
Jadavpur University

Dean
Faculty of Interdisciplinary Studies, Law & Management
Jadavpur University, Kolkata-700032

14.05.19

Director
School of Languages and
Linguistics
Jadavpur University

Director
School of Languages and Linguistics
Jadavpur University

14/05/19

Supervisor
Department of Film Studies
Jadavpur University

MOINAK BISWAS
PROFESSOR
Department of Film Studies
Jadavpur University

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

গবেষণা কর্মের শুরু থেকে গবেষণার এই বিস্তৃতি এবং সমস্যাকীর্ণ পথের অভিযানে প্রতিমুহূর্তে সূত্রধারের ভূমিকা পালন করেছেন অধ্যাপক ড. মৈনাক বিশ্বাস। তিনি আমার গবেষণা কর্মের তত্ত্বাবধায়ক হিসাবে সময়োচিত উৎসাহ, প্রয়োজনীয় নির্দেশনা এবং বহু মূল্যবান গ্রন্থের অনুসন্ধান দিয়েছেন। গবেষণা-সহায়ক হিসেবে তাঁর সান্নিধ্য পেয়ে আমি গর্বিত। এই অবকাশে স্মরণ করি দুই শিক্ষকের ভূমিকাকে যাঁরা নেপথ্যে থেকে আমার ব্যক্তিত্বকে নির্মাণ করেছেন। তৈরি করে দিয়েছেন পড়াশুনার অভ্যাসকে। নতুন নতুন চিন্তা-ভাবনাকে উসকে দিয়েছেন তর্কে-বিতর্কে আলোচনার মাধ্যমে। তাঁদের গভীর সান্নিধ্যে স্পর্শ পেয়েছি উচ্চ আদর্শ ও উদার মানবিকতার। এসবই আমার পাথেয়, অন্তর্লীন প্রেরণা হিসেবে সক্রিয়। এই দু'জন শিক্ষক হলেন কলেজের অধ্যাপক শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ড. উত্তম দত্ত ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক তথা আমার পরম পূজনীয় অধ্যাপক ড. উদয় কুমার চক্রবর্তী। দ্বিতীয়ত জন্মদাতা মা-বাবার প্রতি আমার সশ্রদ্ধ সালাম। যাঁদের আপ্রাণ চেষ্টা এবং অক্লান্ত শারীরিক শ্রম আমাকে এই পর্যায়ে পৌঁছে দিয়েছে। সেইসঙ্গে কৃতজ্ঞ জানাবো আমার বড় দাদাকে, যার সাহায্য ছাড়া প্রথম প্রজন্মের শিক্ষার্থী হিসাবে আর্থ-সামাজিক প্রতিবন্ধকতা পেরিয়ে শিক্ষার অঙ্গনে আসা এবং এই গবেষণা সন্দর্ভটি প্রস্তুত করা অসম্ভব ছিল।

এই গবেষণার নেপথ্যে যাঁদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সুপরামর্শ ও শুভকামনা রয়েছে অর্থাৎ যাঁদের সাহায্য ছাড়া একাজ সম্ভব হত না তাদের নাম উল্লেখ না করলে নিজেকে অকৃতজ্ঞতার পরিসরে ঠেলে দেওয়া হবে। সমীর স্যার, অতনু স্যার, সুজিত স্যার, রাজু দা, বরেন্দু স্যার, সামন্তক স্যার, শাশ্বত স্যার, জয়দীপ স্যার, যাঁদের সান্নিধ্য আমার ভাবনার জগতকে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান করতে বিশেষভাবে সাহায্য করেছে। তাছাড়াও আমি প্রত্যক্ষভাবে ঋণ স্বীকার করছি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষা বিভাগ ও সাহিত্য বিভাগীয় গ্রন্থাগারের হরিশ দা, আইভি দি এবং মমতা দি'র কাছে। তাঁরা সবসময় যাবতীয় পুস্তকাদি ও বিভিন্ন পত্র পত্রিকা দিয়ে সাহায্য করেছেন।

আমি কৃতজ্ঞতা জানাই 'চতুর্থ দুনিয়া' প্রকাশনার কর্ণধারকে। যিনি দোকানের কাউন্টারে দাঁড়িয়ে আমার গবেষণার বিষয় ও সমস্যার কথা শুনেই বিনা প্রশ্নেই প্রয়োজনীয় পাঠ্য পুস্তক ছাড়াও দুষ্প্রাপ্য ও

অমূল্য পত্র-পত্রিকা নির্দ্ধিধায় আমার হাতে তুলে দিয়েছেন। শুধু তাই নয়, অনেক প্রাসঙ্গিক রেফারেন্সের সন্ধান দিয়েছেন। তাঁর এই অ্যাকাডেমিক সহযোগিতা না পেলে আমার গবেষণা অনেকটাই শ্লথ হয়ে যেত।

তাছাড়া ধন্যবাদ জানাই যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন গবেষকদের যাদের কাছ থেকে সময়ে অসময়ে নানান বিষয়ে সহায়তা পেয়েছি। বিশেষ করে স্বপন দা, পিন্টু দা, চৈতন্য দা, তুহিন দা, রকিবুল দা, ও সুজন দা যাদের সাহায্য এবং মূল্যবান উপদেশ আমার ভাবনার জগৎকে ত্বরান্বিত করেছে। সহপাঠী সম্রাট, তাপস, সঞ্জয়, সৌমিত্র, গোলজার, আবির এদের সহযোগিতা আমার গবেষণার কাজে বিভিন্নভাবে উৎসাহ জুগিয়েছে আমি তাদের সকলের কাছে কৃতজ্ঞ। এছাড়াও সমগ্র গবেষণা কর্মে সবসময়ে যার সাহায্য ও পাশে থাকা আমাকে বিশেষভাবে উদ্বুদ্ধ করেছে এবং মাথা ঠাণ্ডা রেখে ভাবতে শিখিয়েছে সে হল প্রিয় বন্ধু আবিদা সুলতানা। সেইসঙ্গে বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করি আমার সবচেয়ে কাছের বন্ধু কৌশিকের কাছে। সাহিত্য-শিক্ষা-ইতিহাস-সমাজবিদ্যা প্রভৃতি বিষয়ে তাঁর চিন্তার মৌলিকতা ও স্বচ্ছতা আমার গবেষণা কর্মে সহায়তা জুগিয়েছে।

সবশেষে শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা সেই দুজন ব্যক্তিকে (মনোরঞ্জন ব্যাপারী, মনোহরমৌলি বিশ্বাস) যাঁদের শিকড়ছেঁড়া জীবনের ইতিহাস আমার গবেষণার মূল উপাদান। যাঁদের জীবনের রক্তক্ষত দলিল এবং সশরীরে সাক্ষাৎলাভ শুধুমাত্র গবেষণার বিষয়কেই নয় জীবন সম্পর্কে আমার দৃষ্টিভঙ্গিকেই বদলে দিয়েছে।

নিবেদনান্তে-

আলী হোসেন

তারিখ : ১৫-০৫-২০১৯

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ভাষা বিভাগ

একবিংশ শতকে বাংলা সাহিত্যে নূতন ভুবন : দলিত আত্মজীবনী

সূচিপত্র

পৃষ্ঠা নং-

ভূমিকা ৮-৯

দলিত সাহিত্যের প্রেক্ষাপট : ১০-২১

প্রথম অধ্যায় : ১৭-৩৪

দলিত আত্মকথার স্বরূপ সন্ধান : 'ইতিবৃত্তে চণ্ডাল জীবন' ও 'আমার ভুবনে আমি বেঁচে থাকি'

দ্বিতীয় অধ্যায় : ৩৫-৫৬

সমাজ বাস্তবতার দুই মেরু থেকে উঠে আসা দু-ধরনের সাহিত্যে লেখকের অভিজ্ঞতার নান্দনিক পার্থক্য ও তুলনামূলক আলোচনা।

তৃতীয় অধ্যায় : ৫৭-৬৫

দলিত আত্মপরিচয়ের সংকট

চতুর্থ অধ্যায় : ৬৬-৭৭

আত্মকথার দর্পণে দলিত নারী ও ভারতীয় সমাজ

উপসংহার ৭৮-৮২

গ্রন্থপঞ্জি ৮০-৮৩

প্রাককথন

অস্পৃশ্য, দলিত, অপাংক্তেয়, সমাজের নিম্নবর্গ তথা সমাজের তলানীতে বসবাসকারী মানুষের ইতিহাস ও তাঁদের অশান্ত অন্তর্লোকের দৃশ্য, জীবনযাত্রা সম্পর্কে জানার কৌতূহল আমার অনেকদিনের। ফলে সেইসব মানুষজনদের নিয়ে লেখা গল্প, উপন্যাস, কবিতা, প্রবন্ধ, সম্পাদকীয় কলম ও বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা হাতের কাছে পেলেই সাগ্রহে পড়ে ফেলতাম। কিন্তু সেইসব লেখার মধ্যে থেকে যে ছবিটা আমার কাছে উপস্থিত হত তা ছিল অনেকটাই ভাসাভাসা তথা অস্পষ্ট। ফলে আমি খুঁজতাম সেইসব নেই-রাজ্যের বাসিন্দাদের নিজের জীবনকে নিয়ে লেখা কোনও গল্প। এর কারণ হয়তো বয়স ছিল তখন অপরিণত এবং বিশ্লেষণের ক্ষমতাও ছিল সংকুচিত। এখন বয়স বাড়লেও বিচার বুদ্ধি ও বিশ্লেষণের ক্ষমতা বিশেষ কিছু বদলায়নি। কিন্তু তখনকার সেই পাঠকৃতির আলোচনা মনের মধ্যে একটা গভীর দাগ কেটেছিল। তারই প্রগাঢ় প্রলেপ আজও থেকে গেছে মনের গভীরে এবং আজকের দিনে তা অনেকটাই বাস্তব, বলিষ্ঠ, সমাজ সচেতন হয়েছে। আর সেই তাগিদ থেকেই আমি আমার এম. ফিল গবেষণা পত্রের বিষয় হিসাবে বেছে নিয়েছি অবমানিত ও অপমানিত কয়েকটি 'আত্মার' আত্মস্মৃতিকে। আমার আলোচ্য গবেষণা পত্রে সমস্ত মতানৈক্য ও মতদ্বৈততাকে উহ্য রেখে সাপেক্ষ শর্তে উক্ত মানুষদের কথা তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। ফলে দলিত চর্চার তাত্ত্বিক কাঠামোর বেড়াজাল ভেঙ্গে আলোচনার পরিসর ব্যপ্ত হয়েছে। যেখানে- দলিত, নিম্নবর্গ, পতিত, ব্রাত্য, প্রান্তিক, অপজাত, সংখ্যালঘু, নারী প্রভৃতি শ্রেণি মিলেমিশে একাকার হয়ে গিয়েছে। আর এঁদের মধ্যে থেকেই তুলে ধরা হয়েছে এমন কয়েকজন মানুষের 'আত্মজীবনী' যারা বাংলা সাহিত্যের আঙিনায় 'দলিত লেখক' হিসাবে ঠাঁই পেয়েছেন ঠিকই কিন্তু ব্যাপক অর্থে এখনও অনেকরই অজানা। সেইসব নির্বাচিত আত্মজীবনীকে বাংলা সাহিত্যের পারম্পর্য অনুসারে বেছে নেওয়া হয়েছে এবং পূর্বসূরীদের মতাদর্শকে শিরোধার্য করে বিচার-বিশ্লেষণ করা হয়েছে। সেই সঙ্গে তুলে ধরা হয়েছে সেইসব মানুষগুলির চারিত্রিক বিশিষ্টতা, তাদের অসহায়তা, কষ্টে-অনাহারে দিনযাপনের ছবি, প্রতিবাদ-প্রতিরোধ, ঘাম-রক্ত দিয়ে গড়া স্বপ্ন, সেই স্বপ্নের ভাঙন এবং স্রষ্টার শৈল্পিক কারুকার্য।

গবেষণার ক্ষেত্র :

প্রত্যেক গবেষণায় একটা নির্দিষ্ট সীমা থাকা আবশ্যক। তাই আমার এই গবেষণার ক্ষেত্র হিসেবে আমি বেছে নিয়েছি একবিংশ শতকের বাংলা সাহিত্যে নির্বাচিত কয়েকজন দলিত লেখকের আত্মজীবনীকে। ব্রাহ্মণ্যবাদী ব্যবস্থা জন্মলগ্নেই যাঁদেরকে নীচু বলে ছাপ মেরে দিয়েছে। বর্ণ-বিভাজিত সমাজব্যবস্থায় অত্মপরিচিতি প্রকাশমান হতে না হতেই যাঁদের জীবনে জুটেছে অপমান, অবমাননা এবং অসম্মান। এঁদের মধ্যে দুজন হলেন মনোরঞ্জন ব্যাপারী- ইতিবৃত্তে চন্ডাল জীবন; মনোহরমৌলি বিশ্বাস- আমার ভুবনে আমি বেঁচে থাকি। এছাড়াও ভারতীয় সমাজে দলিত নারীরা কীভাবে শোষণ-বঞ্চনা ও নিপীড়নের শিকার হয়, কয়েকজন দলিত লেখিকার আত্মজীবনীকে সামনে রেখে সেই অবস্থাকে কিছুটা তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। সেইসঙ্গে দলিত নারীসমস্যা ও নারীপ্রশ্নে ড. বি আর আম্বেদকর এবং মহাত্মা জ্যোতিরাও ফুলে'র আলোচনাও উপস্থাপন করার চেষ্টা করা হয়েছে।

পূর্ববর্তী সাহিত্য সমীক্ষা:

এই গবেষণা সন্দর্ভটি নির্মাণ করতে গিয়ে পূর্ববর্তী সাহিত্য সমীক্ষা পর্বে আমি বাংলা সাহিত্য এবং বাংলা সাহিত্যের বাইরে যে দলিত আত্মজীবনীগুলি রচিত হয়েছে সেগুলি সংগ্রহ করেছি। যেমন- ইতিবৃত্তে চন্ডাল জীবন'– মনোরঞ্জন ব্যাপারী; আমার ভুবনে আমি বেঁচে থাকি- মনোহরমৌলি বিশ্বাস; 'হাথক দর্পণ'- রামচন্দ্র প্রামাণিক; 'হৃদয় নদী'- হরিশংকর জলদাস; 'আমার জীবন ও কিছু কথা'- কান্তি বিশ্বাস; 'আমি কেন চাঁড়াল লিখি'–কল্যাণী ঠাকুর; 'ভাঙা বেড়ার পাঁচালী'– লিলি হালদার। বাংলা ছাড়াও অন্যান্য সাহিত্য থেকে যেমন, শরণ কুমার লিম্বলে- 'The Outcaste', দয়া পাওয়ার- 'বলুতা' এবং শান্তাবাঈ কাম্বলের 'Majya Jalmachi Chittarkatha'- প্রভৃতি।

এছাড়াও প্রাথমিক উপাত্ত স্বরূপ বা প্রাইমারি রেফারেন্স গ্রন্থ হিসেবে দলিত সাহিত্য নিয়ে আলোচিত বিভিন্ন পুস্তকাদি পত্র-পত্রিকা এবং প্রবন্ধ সংগ্রহ করা হয়েছে। যার তালিকা সহায়ক গ্রন্থসূচিতে উল্লেখ করা হয়েছে। সমগ্র গবেষণা সন্দর্ভটি নির্মিত হয়েছে মূলত Descriptive এবং Referential পদ্ধতি অবলম্বনে।

বিষয় সংক্ষেপ :

আত্মোন্নয়নের সংগ্রামে যে হৃদয় সিক্ত, বর্ণ-বিভাজিত সমাজব্যবস্থায় আত্মপরিচিতি প্রকাশ পেতে না পেতেই যে ব্যক্তি মানুষ অসম্মানিত, সেইরকম দুজন দলিত লেখকের (মনোরঞ্জন ব্যাপারী ও মনোহরমৌলি বিশ্বাস) এবং দুজন দলিত নারীর (কল্যাণী ঠাকুর ও লিলি হালদার) 'আত্মজীবনী' এই গবেষণা সন্দর্ভের প্রধান আলোচ্য বিষয়। এইসব মানুষকে নিয়ে 'ইতিহাস চর্চা'র তিন দশকেরও বেশি সময়কাল অতিক্রান্ত হলেও দলিত, প্রান্তিক, নিম্নবর্গ কারা, কেন? এসব প্রশ্নের মীমাংসার মাপকাঠি আজও তৈরি হয়নি। ভারতবর্ষের ইতিহাসে দীর্ঘ সময়কাল ধরে নিজের অস্তিত্ব, মর্যাদা, নিজস্ব অধিকার, সামাজিক ন্যায়ের জন্য লড়াই ছিল এদের জীবনের মূল লক্ষ্য। স্বাধীনতার সত্তর বছর পরেও এইসব মানুষ সমাজে স্তরভেদে শিক্ষার ক্ষেত্রে, সংস্কৃতির ক্ষেত্রে, সামাজিক ক্ষেত্রে, সৃজনশীলতার ক্ষেত্রে বৈষম্যের স্বীকার। কীভাবে সেই বৈষম্যের শিকার হতে হতে অনাহারে থাকা মানুষের রসবোধ, দারিদ্রে প্রপীড়িত মানুষের আত্মসুখ, সামাজিকভাবে ঘৃণিত মানুষের ভিতরকার তৃপ্তির উৎসভূমি শুকিয়ে যায় এবং কীভাবে খিদের তাড়নার সঙ্গে মিশে থাকা অপমানের জ্বালা তাদের দগ্ধায় প্রথম অধ্যায়ের অলোচনায় মূলত সেই বিষয়কে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

গতানুগতিক তথা প্রগতিশীল সাহিত্য ধারায় সচরাচর যে এসথেটিক আমরা দেখতে পাই দলিত সাহিত্যের এসথেটিক তা নয়। চিরাচরিত সাহিত্যের ধারা মূলত ব্যাখ্যাত হয় 'সত্যম শিবম সুন্দরম' তত্ত্বকে আঁকড়ে ধরে। অর্থাৎ একটু অন্যভাবে বলা যায় এ সাহিত্য 'পায়ের নীচের মাটি থেকে আকাশের নক্ষত্র পর্যন্ত সবই সত্য, সবই সুন্দর' এই ভাবনাকে আশ্রয় করে। কিন্তু দলিত সাহিত্যে 'শিবম' বলে কিছু নেই। এখানে যা বাস্তব তাই সত্য। একই বিষয় ভিন্ন দৃষ্টিতে ভিন্ন রূপ পায়। এতে একদিকে যেমন সাহিত্যের নন্দনতত্ত্ব যায় বদলে তেমনি বদলে যায় সেই সাহিত্যের রচনাকারের দৃষ্টিভঙ্গি। দ্বিতীয় অধ্যায়ের আলোচনায় প্রাধান্য পেয়েছে সমাজ বাস্তবতার দুই মেরু থেকে উঠে আসা দু-ধরণের লেখকের দৃষ্টিভঙ্গি তথা অভিজ্ঞতার পার্থক্য ও তুলনামূলক আলোচনা।

পেটের খিদে মিটিয়ে বেঁচে থাকা প্রত্যেক জীবের প্রধান ধর্ম। কিন্তু মানুষের ক্ষেত্রে বিষয়টি একটু অন্যরকম। খিদের পাশাপাশি মানুষ তালাশ করে আত্ম-সম্মানবোধের। তাই যখন কোনো দলিত গোষ্ঠী বা ব্যক্তির মধ্যে আত্ম-সম্মানবোধের সংকট প্রবল হয়ে ওঠে তখন তাঁর মধ্যে আত্মপরিচয় প্রকাশের এক বিশেষ উদ্যোগ দেখা যায়। কিন্তু বর্ণ-বিভাজিত সমাজ ব্যবস্থায় তাঁদের আত্মপরিচয়ের প্রকাশ ততটা সহজ নয়। তাই বর্ণ-বিভাজন ও শ্রেণীবিভাজন কিভাবে একসাথে মিলেমিশে দলিত জনগোষ্ঠীর তথা দলিত ব্যক্তি মানবের আত্মপরিচয়কে কলঙ্কিত করেছে সেই বিষয়কে সংক্ষেপে তুলে ধরার চেষ্টা হয়েছে তৃতীয় অধ্যায়ের আলোচনায়।

দলিতদের মধ্যে মেয়েরা মেয়ে হিশেবেই আরো এক পেষণের শিকার। দলিতদের সমবেত বেঁচে থাকার অধিকারের মধ্যে মেয়েদের মেয়ে হয়ে বেঁচে থাকার আলাদা যন্ত্রণার কথা সম্প্রতি দলিত মেয়েরাই বলতে শুরু করেছেন। এতদিন দেখা যেত দলিত মেয়েদের মধ্যে দু-একজন কবিতা, গল্প ইত্যাদি লিখতেন। কিন্তু এখন দলিত মেয়েরা কবিতা ও গল্পের সঙ্গে আত্মজীবনীও লিখছেন। সেইসব লেখায় তাঁদের দলিত অস্তিত্বের যন্ত্রণার সঙ্গে মিশেছে নারী অস্তিত্বের যন্ত্রণা। সেইসঙ্গে কিভাবে তাঁরা সমাজের উচ্চবর্ণের মানুষ এবং ক্ষমতাশালীদের ক্ষমতার কাছে দলিত হিসাবে হেনস্থার শিকার হন চতুর্থ অধ্যায়ের আলোচনায় মূলত সেই বিষয়কেই তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

ভূমিকা

আমরা জানি সমাজ সম্পৃক্ত সাহিত্যে দেশ- কাল- পটভূমির গুরুত্ব অপরিসীম। শিল্প-সাহিত্য যেহেতু মনুষ্য সৃষ্ট সেহেতু সেখানে মানুষের জীবনই প্রধান। দেশের মানুষ বলতে শুধু উচ্চবর্গের মানুষকেই বোঝায় না। দেশের ৮০-৮৫ শতাংশ সংখ্যাগরিষ্ঠ আম আদমিকেও বোঝায়। কিন্তু শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে সমাজে জাতিগত, ধর্মগত, বর্ণগত, গুণগত, পেশাগত, বৃত্তগত, শ্রেণিগত, লিঙ্গগত প্রভৃতি স্তর বিভাজনের কারণে সমাজের উপরতলার মুষ্টিমেয় সুবিধাভোগী, স্বার্থসন্ধানী মানুষ তথা পুরোহিত, বণিক, শাসক প্রভৃতি সম্প্রদায়ের দ্বারা তারা প্রতিনিয়ত শোষণ-বঞ্চনার শিকার হয়। অথচ দেশের এই বেশিরভাগ মানুষই হলেন সভ্যতার মূলীভূত শক্তি। কিন্তু এই বিশাল জনসমাজ একদিকে যেমন ইতিহাসের পাতায় যথাযোগ্য মর্যাদা পায়নি। তেমনি শিল্প-সাহিত্যেও তাদের ছিল না কোন স্থান। কারণ মুষ্টিমেয় সেই সুবিধাভোগী মানুষজন তাদেরকে রেখে দিয়েছে লোকচক্ষুর আড়ালে। সমাজ বিবর্তনের ধারায় শোষকের চেহারা ও তাদের শোষণ পদ্ধতির বদল ঘটে আর সমাজের সেইসব দলিত শোষিত মানুষেরা পড়ে পড়ে মার খায়। সমাজ বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ইতিহাসের এইসব অবহেলিত মানুষগুলিকে মাঝে মাঝে প্রতিবাদের আগুনে ফেটে পড়তে এবং তাদের বিদ্রোহী রুপে বারবার ঝলসে উঠতে দেখা যায়। কিন্তু তাদের কোনো দলিল দস্তাবেজ নেই; নেই কোনো প্রচারের আলোয় আসবার ক্ষমতা। একই ভূখণ্ডে বসবাস করেও তারা হলেন নেই-রাজ্যের বাসিন্দা। তারা মূল স্রোতের ধাক্কায় পর্যুদস্ত ও দিশেহারা। তারা যেন অনেকটাই নিজভুমিতে বসবাস করেও পরবাসী। ভারতবর্ষে এর প্রধান কারণ হিসাবে জাতিভেদ ব্যবস্থাকেই অনেকটা দায়ী করা যায়।

জাতিভেদ ব্যবস্থা মানুষে মানুষে বিভাজনকে যেভাবে পোক্ত করেছে তেমনি মনুষ্য সমাজের ক্ষেত্রে এ হল এক বিস্ময়জনক ঘটনা। বর্তমানে পৃথিবীতে স্বীকৃত ধর্মের সংখ্যা হল ৯ টি। হিন্দুধর্মের আরেক নাম হল সনাতন ধর্ম। এই ধর্ম কবে নাগাদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তার সঠিক ঐতিহাসিক কাল কষ্টিপাথরে ঘষেও নিরূপণ করা অসম্ভব। এর যেমন জন্মকাল নেই সম্ভবত এর মৃত্যুকালও নেই। যার জন্ম নেই মৃত্যু নেই তা হল অব্যয় এবং সনাতন। ভিন্নভাবে যদি বলি তাহলে বলা যায় যে মানুষের বেঁচে থাকার কতকগুলি প্রক্রিয়ার নাম হল হিন্দুধর্ম। জাতিভেদ, বর্ণভেদ বুকে ধারণ করে চলেছে সেই প্রক্রিয়া।

ভেদ আর মিলনের সমাহারে গড়ে ওঠা 'সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদ' দিয়ে কেউ কেউ এক শক্তিশালী হিন্দু ভারতের কথা বলেছেন। কিন্তু ছোটো-বড়োর ভাবনাকে ভিতরে পুষে রেখে সামাজিকভাবে পরস্পরের মধ্যে দূরত্ব রেখে, ঘৃণা ও অস্পৃশ্যতার ভিতর দিয়ে সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবোধের অস্তিত্ব গড়ে ওঠে কি? এটাই আমার প্রশ্ন। অন্তরের মিলনে এক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তিকে কোলাকুলি করেন, একে অপরকে বুকে জড়িয়ে ধরেন। এর বাইরেও যে মিলন তা কেবল বাক্যে সম্ভব, বাস্তবে সম্ভব হয় না। মানব জাতির সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ সাধন প্রতিটি মানুষের চারিত্রিক সম্পদ হওয়া উচিত। সাধারণ মানুষের কল্যাণের ভিতর দিয়ে গড়ে ওঠে জাতীয় ঐক্য। কিন্তু আমাদের দেশের মানুষে মানুষে, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে কৃত্রিম ভেদ সৃষ্টিকারী জাতিভেদ প্রথা মূলত জাতিয় ঐক্যের পরিপন্থী। এই জাতিভেদ প্রথার প্রতি তীব্র ঘৃণা ছিল রামমোহন রায়ের। ভেদ ব্যবস্থার কঠোর সমালোচনা করতে তিনি কখনোই কুণ্ঠিত বোধ করেননি। জাতিভেদ ও বর্ণভেদ আসলে মানুষের চিত্ত সঞ্জাত এক প্রকার কুসংস্কার। এর কোনও বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই।

প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে 'ব্রাত্য' তথা 'জাতহীন' শ্রেণি ভারতীয় সমাজের অবধারিত অংশ হিসাবে উপস্থাপিত হয়েছে। শুধু তাদের উপস্থাপন ও উপস্থিতিই তাদের দাবির প্রয়োজন মেটাতে পারে না, তার জন্য প্রয়োজন এইসব দলিত তথা নিম্নবর্গের মানস কাঠামোকে সেই অবস্থান থেকেই উপস্থাপন করা। এরকম এক পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে সম্প্রতি দলিত সমাজের মধ্যে বসবাসকারী কয়েকজন লেখক এবং লেখিকা নিজের জীবনের ইতিহাস ব্যাখ্যায় তুলে ধরেছেন সেই জাতির মানস কাঠামোকে। সেইসব লেখকদের মধ্যে অন্যতম দুজন লেখকের (মনোরঞ্জন ব্যাপারী-*ইতিবৃত্তে চণ্ডাল জীবন* এবং মনোহরমৌলী বিশ্বাস-*আমার ভুবনে আমি বেঁচে থাকি*) ও দুজন লেখিকার (কল্যাণী ঠাকুর-*আমি কেন চাঁড়াল লিখি* এবং লিলি হালদার-*ভাঙা বেড়ার পাঁচালী*) আত্মজীবনী নিয়েই আমার গবেষণা সন্দর্ভের মূল আলোচনা। বাংলা সাহিত্যের পাঠকদের কাছে এইসব লেখকের লেখা একেবারেই অনন্য এক অভিজ্ঞতা। তার প্রধান কারণ, বাংলা সাহিত্য সমাজের চেনা যে বৃত্ত, এঁরা একেবারে তার বাইরের লোক। ভিন্ন মেরু থেকে উঠে আসা। তাঁরা জন্ম মুহূর্ত থেকেই অভিশাপগ্রস্ত মানুষ। তাই তাঁদের লেখা এইসব আত্মজীবনী বাংলা সাহিত্যের ধারায় এক নূতন জগৎ সৃষ্টি করেছে।

দলিত সাহিত্যের প্রেক্ষাপট :

বাংলা ভাষায় দলিত সাহিত্যের উদ্ভব ঠিক কোন সময় থেকে তা নিয়ে ধোঁয়াশা থাকলেও একথা স্পষ্ট যে ১৯০৯ সালে রাসবিহারী রায়ের সম্পাদনায় 'নমঃশূদ্র দর্পণ' পত্রিকার আত্মপ্রকাশ বাংলায় দলিত সাহিত্য আন্দোলনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। উল্লেখ্য যে সম্পাদক নিজে সেই সময় নিজের কাঁধে পত্রিকা নিয়ে খুলনা, যশোর, ২৪ পরগণা, হুগলী জেলার প্রত্যন্ত তপশিলি অঞ্চলে গিয়ে কার্যত 'পুশ সেল' করে পত্রিকার খরচ নির্বাহ করতেন। অনেকের মতে তাঁর এই উদ্যোগ ও দায়বদ্ধতা কুমারখালির 'কাঙাল হরিনাথ' (১৮৩৩-১৮৯৬) কিংবা মুর্শিদাবাদ জেলার জঙ্গিপুরের 'দাদাঠাকুরের' (১৮৮০-১৯৬৮) কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। ধীরে ধীরে সারা বাংলা জুড়ে মানুষ সংগঠিত হতে শুরু করে। অধুনা বাংলাদেশের পাবনা জেলার অন্তর্গত বেড়ার নাকালিয়া সাঁড়াশিয়া গ্রামে ১৯১৮ খ্রিষ্টাব্দের ২৮ শে ডিসেম্বর জন্মগ্রহণ করেন জিতেন্দ্রনাথ গোস্বামী। সেইসময় পন্ডিত প্রিয়নাথ সরকার ছিলেন ঝল্যমল্য ত্রিয় পাঠশালার প্রধান পণ্ডিত। সেই পাঠশালায় বালক জিতেন তৃতীয় শ্রেণি পর্যন্ত পাঠ সমাপ্ত করে বাবা প্রাণনাথ হালদারের সঙ্গে পদ্মা, যমুনা, ইছামতীতে মাছ ধরার পেশায় যুক্ত হয়ে যান। তার লেখাপড়া এখানেই সমাপ্ত। নৌকায় শুরু হয় তার জীবনের আর এক পাঠশালা, ঘর-সংসার এবং রাত্রিযাপন। প্রতিদিন রাতে ঘুমাতে যাবার পূর্বে বালক জিতেন গলা ছেড়ে আপন মনে নিজের রচনা করা গান গাইতেন। তাঁর গানের বাণী আর সুর শুনে ওস্তাদ হরিপদ সরকার মুগ্ধ হয়ে জিতেনকে আপন করে নেন। সেই থেকে জিতেন ওস্তাদ হরিপদ সরকারের নিকট সংগীতচর্চা, জারি ও সারি গান, কবিগান, ধর্মীয়পাঠ ইত্যাদি বিষয়ে তালিম নিয়ে মাত্র ২৪ বছর বয়সে কবি গানের পালায় নাম লেখান। চৈতন্য গুরু সুধীরচাঁদ তাঁকে গুরুর আসন দিয়ে কাঙ্গাল জিতেন্দ্রনাথ গোস্বামী নাম প্রদান করেন। পাবনা জেলার সিরাজগঞ্জের পৌণ্ড্র ('পৌন্ড্র'-হল পৌন্ড্রক্ষত্রিয় তফসিলভুক্ত একটি জনগোষ্ঠী। ১৯৭২ সালের বাংলাদেশ জনবিবরণীতে এই জনগোষ্ঠীকে 'পোদ' আভিধায় উল্লেখ করা হয়। বর্তমানের ভাষায় অনগ্রসর সম্প্রদায়।) জাতির মণীন্দ্রনাথ মণ্ডল সেই 'জিতেন্দ্রনাথ'কে নিয়ে লিখে সমাজকর্মীরূপে পরিচিত হন। বরিশালের স্বরূপকাঠির মালুহার গ্রাম থেকে ১৯১১ সালের এপ্রিল মাসে শশিকুমার বাড়ৈবিশ্বাসের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় 'নমঃশূদ্র দ্বিজতত্ত্ব'।

আবার একই সময়ে মাথাভাঙ্গার খালসামারি গ্রামের ঠাকুর পঞ্চাননের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয় ‘উত্তরবঙ্গ সাহিত্য পরিষদ। এছাড়াও এই সময়ের উল্লেখযোগ্য দলিত পত্রিকারূপে বিবেচিত হয়- বলরাম সরকার সম্পাদিত ‘নমঃশূদ্র জ্ঞানভাণ্ডার’ ও জ্ঞানেন্দ্রনাথ মজুমদার সম্পাদিত ‘নমঃশূদ্র চন্দ্রিকা’। ১৯১৫ সালে প্রকাশিত হয় বর্ধমান জেলার দরিদ্র নমঃশূদ্র পরিবারের সন্তান হরিদাস পালিতের আত্মচরিত ‘একজন পতিত জাতির কর্মী। সত্তরের দশকে নরেশ দাশের সভাপতিত্বে গঠিত হয় ‘নবযুগ সাহিত্য ও সংস্কৃতি পরিষদ’। আশির দশকে নকুল মল্লিকের উদ্যোগে ‘বঙ্গীয় দলিত লেখক পরিষদ’ গঠিত হয়। মোটামুটিভাবে বলা যায় এইভাবে ধীরে ধীরে বাংলায় দলিত সাহিত্যের প্রচার ও প্রসার ঘটতে শুরু করে। তবে একথা বলাই বাহুল্য যে শুধুমাত্র বাংলা ভাষায় নয়, ইংরেজি ভাষাতেও যাতে এই সাহিত্যের বিকাশ সাধিত হয় সেকথা মাথায় রেখে ড. এ আর বিশ্বাস ও ড. জে পি মণ্ডলের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয় ‘রাইটিং আকাদেমি অফ লেটার্স’। পরবর্তীকালে ইংরেজি পত্রিকা ‘দলিত মিরর’ কলকাতা থেকে প্রকাশিত হতে শুরু করে। আরোও কিছু পরে যখন দলিত সাহিত্য আলোচনার বিষয় হয়ে উঠল তখন তার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে অনেক সংশয় দেখা দিল। অনেকের বিশ্বাস এই ধরনের নব পথের উম্মোচন সম্ভব নয়, অন্যরা এটাকে ভাবলেন সাম্প্রদায়িক। অন্যদিকে, কিছু দলিত নিজেদের করে তোলেন ব্রাহ্মণতুল্য এবং ব্রাহ্মণদের মতো কথা বলা, পড়াশুনা ও লেখার চেষ্টা শুরু করেন। তাঁরা অতীতকে ভুলে যেতে চেয়েছিলেন। বাস্তবের মুখোমুখি হবার সাহস তাঁদের না থাকলেও একথা সত্য যে তাঁরা আসলে এসবের মধ্যে দিয়ে একধরণের দলিত ঐক্য গড়তে চেয়েছিল। যেমন সেই সময়ে ‘আমহি’ পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত বাবুরাও বাগুলের উপন্যাস ‘পৌষ্য’ এবং অধ্যাপক পি. আই. সেনকাম্বলের আত্মজীবনীমূলক ধারাবাহিক ‘আঠয়ানিনচে পকশি’র বিরুদ্ধে প্রচার দলিত ব্রাহ্মণদের এই দৃষ্টিভঙ্গিরই প্রতিফলন। কেউ কেউ আবার এই ঐক্যের মধ্যে লক্ষ্য করলেন ভীরুতা। একদিকে তাঁরা ডঃ আম্বেদকরের আন্দোলন থেকে উদ্ভূত যাবতীয় সুযোগসুবিধা নিলেও অন্যদিকে কিন্তু সেই আন্দোলনের কোনো প্রভাব তাঁদের উপর পড়েনি। তাঁরা বিশ্বাস করতেন যে, তাঁদের ব্যক্তিগত উন্নতিতে সমাজেরও উন্নতি হয়েছে। এই সংশয়গুলির একটিরও আজ কোনো অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না।

এখন আমার আলোচনার বিষয় দলিত সাহিত্য কী ও দলিত লেখক কারা?

প্রথমেই যদি বলা হয় দলিত কে? তাহলে বলতে হবে এখনও পর্যন্ত দলিত জনগোষ্ঠীর সর্বসম্মত সংজ্ঞা প্রণীত হয়নি। 'দলিত' শব্দটি হল এক ধরনের বিশেষণ। যার অর্থ দলন করা হয়েছে এমন; মর্দিত, পিষ্ট, উৎপীড়িত, নিপীড়িত- এর ক্রিয়া 'দলা'। যার অর্থ দলন করা; পিষ্ট করা; মর্দন করা, মলন করা; মাড়ানো, নিপীড়িত করা। ড. তপন বাগচী 'যশোর জেলায় দলিত সম্প্রদায় : একটি আর্থ-সামজিক সমীক্ষা' প্রবন্ধে বলেছেন, দলিত একটি রাজনৈতিক প্রতিশব্দ, যার অর্থ দরিদ্র ও শোষিত। তাঁর মতে সংখ্যাগুরুদের কাছে সংখ্যালঘুরা দলিত হিসেবে প্রতিপন্ন হয়।

ভারতবর্ষের জাতিভেদ প্রথা :

অসীম স্রষ্টার সসীম সৃষ্টির অতি ক্ষুদ্র একক হল পৃথিবী। অতি ক্ষুদ্র হলেও এর সীমানায় সৃষ্টির পরিসংখ্যান নির্ণয় করার কাজ খুব কঠিন। ধ্বংসের শেষ মুহূর্তেও সর্বাধুনিক প্রযুক্তির সাহায্যেও পৃথিবীতে অবস্থানরত সৃষ্টির সার্বিক যোগফল নির্ণয় করা সম্ভব নয়। অনেক সৃষ্টি তখনও অনাবিষ্কৃত থেকে যাবে। তবে মানুষ প্রতিনিয়তই তার বিচিত্র উদ্ভাবনী ক্ষমতা ব্যবহারের মাধ্যমে সাধারণ চোখে দেখা ও অদেখা সৃষ্টিগুলোর আবিষ্কার অব্যাহত রেখেছে। আর সেই আবিষ্কারের প্রাথমিক পর্যায় হল মৌলিকত্ব। পরবর্তী পদক্ষেপ হল ব্যবহার্য উপকরণের রূপান্তর। মানুষের জৈবিক ও মনস্তাত্ত্বিক প্রয়োজনের সঙ্গতি অনুযায়ী রূপান্তর প্রক্রিয়া চলমান থাকে। জৈবিক প্রয়োজনীতার শেষ থাকলেও মনস্তাত্ত্বিক প্রয়োজন অসীম। ফলে সমষ্টিগত সামাজিক ব্যবস্থায় অসীম মনস্তাত্ত্বিক প্রয়োজন জৈবিক প্রয়োজনীয়তার সংখ্যাকে ক্রমাগত বৃদ্ধি করে আসছে। আর এই স্রোতের মতো ধেয়ে আসা উৎপত্তিমান প্রয়োজন নিবারণের একমাত্র উপায় হল শ্রম অথবা মৃত্যু। প্রতিটি মানুষের কাছে শ্রমই হল মানসিক ও দৈহিক দুই শ্রেণির অংশ। মানসিক শ্রম দৈহিক শ্রমকে পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করে। প্রত্যেকেই মানসিক ও দৈহিক শ্রমের অধিকারী। আর প্রয়োজনের তাগিদে শ্রমের বিভাজন মানব সমাজের সৃষ্টি।

জাতের ভিত্তিতে সমাজ গঠন ভারতীয় সমাজের এক অভিনব বৈশিষ্ট্য। শ্রেণি ও জাতিভেদ প্রথা সম্পর্কে অনেক দেশি বিদেশী সমাজবিজ্ঞানী তাঁদের মতামত ব্যক্ত করেছেন। এই সমস্ত তত্ত্ব আলোচনা করার আগে ভারতীয় সংবিধানের জনক ড. বি. আর আম্বেদকরের (১৮৯১-১৯৫৬) মতামত উপস্থাপন করাই যুক্তিযুক্ত। বর্তমান ভারতের মধ্যপ্রদেশের মোহ অঞ্চলে ১৮৯১ সালে ড. বি আর আম্বেদকর জন্মগ্রহণ করেন। তিনি নিজে ছিলেন একজন দলিত। নিজের জাতির মানুষের জন্য কঠিন সংগ্রাম করেছিলেন তিনি। যা ভারতের ইতিহাসে এক অন্যতম অধ্যায় হয়ে রয়েছে। তিনি বিভিন্ন জাতির বর্ণভেদ ও প্রথাগত নিষ্পেষণ বোঝাতে গিয়ে বলেন-

"রোমানদের ছিল ক্রিতদাস, স্পার্টানদের ছিল সেবাদাস, ইংরেজদের ছিল ভূমিদাস, আমেরিকানদের ছিল নিগ্রো, জার্মানদের ইহুদি আর হিন্দুদের আছে অস্পৃশ্য দলিত"।[১]

দলিত সাহিত্যের প্রসারের ক্ষেত্রে একটি প্রশ্ন প্রায়শই শোনা যায় ড. আম্বেদকরই যদি দলিত সাহিত্যের প্রবর্তক তাহলে তাঁর মৃত্যুর পর কেন দলিত সাহিত্য আন্দোলনের প্রসার ঘটল? বলা যায় অনেকগুলি কারণের জন্য এরকম ঘটেছে। শ্রেণীবৈষাম্যযুক্ত ভারতীয় সমাজব্যবস্থায় ড. আম্বেদকরের জন্মের অনেক আগে থেকেই অস্পৃশ্যরা দারিদ্র্য, অজ্ঞতা ও দুঃখদুর্দশার মধ্যে জীবনযাপন করতেন। ড. আম্বেদকরের আহ্বানে দলিত মানুষদের মধ্যে মনুষ্যত্ববোধের উন্মেষ ঘটল। সাধারণ দলিত মানুষেরা তাঁদের সর্বশক্তি নিয়ে আন্দোলনে যোগ দিলেন। সদ্যজাগ্রত এইসব মানুষ, যাঁরা সাধারণ মানুষের মতো জীবনযাপনের স্বাদই জানত না, যাদের কোনো সাংস্কৃতিক বা সাহিত্যিক উত্তরাধিকার ছিল না, তাঁদের সাহিত্য সচেতনতা থাকবে কীভাবে ? প্রকৃতপক্ষে তাঁদের কাছে এটা আশা করাও যুক্তিহীন। যাই হোক, দলিত শিল্পীরা এই সময়ে সঙ্গীত রচনা করেন, পল্লীগীতি লেখেন, এবং জলসা তামাশা এইসব পরম্পরাগত লোকশিল্পের মধ্য দিয়ে সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেন।

ড. আম্বেদকরের জীবদ্দশায় তাঁর দর্শন ও সংগ্রামের শিল্পিত প্রকাশ মোটামুটি এই রকমের। ড. আম্বেদকরের আন্দোলনের অংশ হিসেবে যেমন সাহিত্য রচনা শুরু হয়েছে তেমনি এই আন্দোলনের আগেও ১৯২০ সাল নাগাদ, বৃটিশ সরকারের কাছে লেখকরা দুর্দশাগ্রস্ত দলিতদের প্রতিনিধিত্ব করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন। এই লেখকেরা মনুস্মৃতি ও হিন্দুদের প্রচলিত রীতিগুলিকে আক্রমণ করেন।

হিন্দুদের প্রাচীন ধর্মশাস্ত্র অনুসারে মাত্র চারটি বর্ণ বা শ্রেণী ছিল। যথা- ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। শ্রম এবং সামাজিক মর্যাদার পরিপ্রেক্ষিতে তখন বিকশিত হল প্রথমে জাতিভেদ প্রথা এবং পরে শ্রেণিপ্রথাকে ব্রাহ্মণদের লেখা হিন্দু গ্রন্থাদিতে ধর্মীয় অনুমোদন দেওয়া হল। ধর্মগ্রন্থগুলিতে জোর দিয়ে বলা হল যে, ব্রাহ্মণদের জন্ম ব্রহ্মার মুখ থেকে, ক্ষত্রিয়দের জন্ম কাঁধ থেকে, বৈশ্যদের উরু থেকে, সবশেষে শূদ্রদের জন্ম ব্রহ্মার পা থেকে। এইজন্যই ব্রাহ্মণের স্থান সর্বোচ্চ আর তাই ব্রাহ্মণেরা ছিলেন পুরোহিত, ক্ষত্রিয়রা যোদ্ধা, বৈশ্যরা ব্যবসায়ী আর শূদ্ররা দক্ষ, অর্ধদক্ষ বা অদক্ষ শ্রমিক হিসেবে কায়িক শ্রম করতেন। এই উচ্চ-নীচ ভেদাভেদ মুখ্যত শ্রেণীভেদ প্রথার আর এক রূপ বলা যায়। ব্রাহ্মণেরা তাঁদের ধর্মগ্রন্থগুলিতে যে সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় বিধি-নিষেধগুলি লিপিবদ্ধ করেন রাজা বা ক্ষত্রিয়রা তা কার্যে পরিণত করতেন।

এইভাবে ধর্মগ্রন্থে বিশেষ জাতির জন্য নির্ধারিত বিশেষ কর্তব্যগুলি পালন করার অর্থ শুধুমাত্র ধর্মীয় বাধ্যবাধকতা নয়, রাজাদেশের প্রতিও আনুগত্য দেখানো। অন্যভাবে বলতে গেলে, ধর্ম ও রাষ্ট্র হাত মিলিয়ে নিম্নতম শ্রেণী অর্থাৎ শূদ্রদের প্রথমে মানসিক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক দাসত্বে বন্দী করল, পরে তাঁরা বাঁধা পড়লেন অস্পৃশ্যতার নাগপাশে।

ড. আম্বেদকর উপলব্ধি করেছিলেন যে জাতিভেদ প্রথার বিকাশ বুঝতে হলে বিষয়টিকে সেই সময়ের অবস্থার পরিপেক্ষিতে দেখতে হবে। ধর্মের সঙ্গে তাকে কোনভাবে যুক্ত করলে চলবে না। তিনি লিখেছিলেন- 'প্রচার জাতিভেদ প্রথার জন্ম দেয়নি, বিলুপ্তিও ঘটাবে না'।

ড. আম্বেদকর তাঁর লেখা *'কাস্টস ইন ইন্ডিয়া- দেয়ার মেকানিজম, জেনেসিস অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট* (১৯১৬), *'অ্যানিহিলেশন অব কাস্ট'* (১৯৩৬) এবং *হু ওয়ার দ্য শুদ্রজ?* (১৯৪৮) এই বইগুলিতে জাতিভেদ প্রথা বিকাশের ধারা খুঁজে বের করেছেন। তাঁর মতে আরও পরবর্তীকালে জাতিভেদ প্রথার ফলে উদ্ভূত এই শ্রেণিগুলি এক একটি অবরুদ্ধ গোষ্ঠীতে পরিণত হয়, শুধুমাত্র জন্মসূত্রেই যেখানে প্রবেশাধিকার মেলে। এইভাবেই জাতিভেদ প্রথার জন্ম হয়। ভারতবর্ষে এই বিকাশ ছিল অভিনব। তাই ১৯৫৬ সালে ১৪ ই অক্টোবর আম্বেদকর যখন বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা নিয়ে জন্মসূত্রে পাওয়া নিজের নির্দিষ্ট ধর্মের সীমা লঙ্ঘন করে নির্বাচিত ধর্মের বিকল্পকে গ্রহণযোগ্য করে তুলে বাস্তবের চেহারা দিলেন, তখন সেই আন্দোলন মহারাষ্ট্রের মহারদের মধ্যে এক নতুন সামাজিক প্রক্রিয়া কার্যকর করে তুলেছিল। বৌদ্ধধর্মই

যে হিন্দুধর্মের অস্পৃশ্যদের একমাত্র ধর্ম হতে পারে তা আম্বেদকর বলে আসছেন কুড়ি বছর ধরেই। সেই ১৯৩৫ সাল থেকে। এই কুড়ি বছর ধরে ধর্ম সংক্রান্ত তুলনামূলক আলোচনা আম্বেদকরের কাছে রাজনীতির একটি প্রধান অংশ ছিল। আর সেই আলোচনা আম্বেদকর উত্থাপন করে রেখেছিলেন গান্ধীজীর বর্ণাশ্রম ধর্মের স্বীকৃতি ও রামরাজ্যের কল্পনার বিরুদ্ধে। আম্বেদকর রামায়ণ, মহাভারত, কাব্য ও যুক্তি এই তিনটির বিরুদ্ধেই এক বিপরীত এপিক ও বিপরীত পুরাণের ভিত তৈরি করে রেখেছিলেন।

ভারতবর্ষের জাতিভেদ প্রথা ও অস্পৃশ্যতার ভয়াবহ প্রকৃতি ও শোষণ প্রক্রিয়া সম্পর্কে জনসাধারণকে সচেতন করে যে সাহিত্য রচিত হচ্ছে তা-ই দলিত সাহিত্য। অন্যভাবে বলতে গেলে, দলিত মানে কোনো জাতি নয়, বরং একটি উপলব্ধি যা সমাজের নিম্নতর স্তরের মানুষের অভিজ্ঞতা, আনন্দ- বেদনা ও সংগ্রামের সাথে যুক্ত। প্রায় সব দলিত সাহিত্যের উৎস যদিও জাতিভেদ প্রথা, তবুও দলিত সাহিত্যের দিগন্ত কিন্তু প্রসারিত হচ্ছে। যেমন ১৯৫০ সাল নাগাদ যখন কলেজ থেকে প্রথম ব্যাচের দলিত তরুণরা স্নাতক হলেন, তখন ঘনশ্যাম তলওয়ালকর ও অন্যান্যরা 'সিদ্ধার্থ সাহিত্য সঙ্ঘ' নামে একটি সাহিত্য সংগঠন গঠন করলেন। এই সংগঠন থেকেই পরে 'মহারাষ্ট্র দলিত সাহিত্য সঙ্ঘ' গঠিত হয়। দলিত নাম সত্ত্বেও এঁদের সাহিত্যে উচ্চবিত্ত সমাজের মূল্যবোধের প্রভাব দেখা দিতে লাগল। তখন তাঁদের যে প্রধান প্রশ্নের মুখে দাঁড়াতে হল তা হচ্ছে, আমাদের জীবন ও সমস্যা অন্যদের জীবন ও সমস্যা থেকে আলাদা। এগুলি কি সাহিত্যে রূপায়িত করা যায়? এ ধরনের সাহিত্য কি জনসমর্থন পাবে? কারণ অভিজ্ঞতাই এই সাহিত্যের সাহিত্যিক প্রকাশের ভিত্তি। ভারতীয় সাহিত্যে দলিত লেখকরাই আত্মস্মৃতি রচনাকে ছোটগল্প ও আখ্যানের মত স্বাতন্ত্র্য দিয়েছেন। বিভিন্ন ভাষায় বহুবিধ আত্মস্মৃতি সাহিত্যের মর্যাদা পেয়েছে, আবার কখনো কোনো লেখকের আত্মস্মৃতি হয়ে উঠেছে তাঁর কবিত্বের ইতিহাস, আর সেই সুত্রেই হয়ে উঠেছে অনেকখানি সামাজিক ইতিহাসও। কিন্তু দলিত লেখকদের আত্মস্মৃতির সঙ্গে এসব পরিচিত লেখার কোনও মিল নেই। কেননা দলিত লেখকরা তাঁদের আত্মজীবনীতে 'আত্ম'কেই (own self) 'বস্তু' করে তুললেন। তাই তাঁদের আত্মকথা হয়ে ওঠে বাস্তবের দলিল। তারা নিজেরাই হয়ে উঠলেন তাঁদের নিজেদের সাহিত্যের বিষয়। সেই আত্মকথা রচনায় তাঁদের একধরণের মুক্তি ঘটে। সে মুক্তি কোনও রাজনৈতিক আন্দোলন থেকে সব সময় আসে না, তা একান্তই অভ্যন্তরীণ মুক্তি। এই মুক্তি আসলে নিজের যে দৈনন্দিন অস্তিত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, সেই অস্তিত্বকে নিজের বাইরে রেখে দেখা।

আসলে এই মুক্তি ঘটানোই শিল্প সাহিত্যের কাজ। তাই তারা আত্মস্মৃতিকে তাঁদের সাহিত্যের প্রধানতম প্রকরণ হিশেবে তৈরি করে নিয়েছেন। এটা প্রথম ঘটেছে ১৯৭৮-এর পর মারাঠি সাহিত্যে। দয়া পাওয়ার এর 'বলুতা', সোনকাম্বলের 'আঠয়ানিনচে পকশি', লক্ষ্মণ মানে-র উপর এর শিল্পসাফল্যই হয়তো আত্মস্মৃতির এই ধরনটিকে দলিত লেখকদের মধ্যে এমন গ্রহণযোগ্য করে তুলেছিল। কিন্তু এসব বাইরের কারণ ছাড়াও ভিতরের এই আবেগটিই প্রধান যে দলিত লেখকেরা সাহিত্যের বিষয় হিসেবে নিজেদেরই আবিস্কার করতে পারেন এই প্রকরণটিতে। কবিতার ভাষায় তারা বদল ঘটাতে পারেন কিন্তু তেমন বদল ষাট-সত্তরের দশকে অনেক ভাষার প্রতিবাদের কবিতায় ঘটে গেছে। তাঁরা গল্পও লিখতে পারেন কিন্তু সেই গল্পের বিষয় নিয়ে এর আগে অ-দলিত লেখকেরাও লিখেছেন। মারাঠি ছাড়া অন্যান্য ভারতীয় ভাষায় দলিত মানুষের কাহিনি আমাদের সামাজিক জীবনের অংশ হিসেবেই এসেছে। তাহলে দলিতজীবনই হচ্ছে দলিত লেখকদের একান্ত নিজস্ব। এই নিজস্বতার বোধ থেকে, নিজের জীবনকে নথিবদ্ধ করার দায় থেকে, এর চাইতে নিজস্ব তার আর কিছু নেই এই অনুভব থেকে দলিত লেখকরা আত্মস্মৃতি তথা আত্মজীবনীকেই তার প্রধান প্রকরণ করে তুলেছেন। নিম্নোক্ত অধ্যায়ে সেই আত্মজীবনীগুলির বিশ্লেষণের মধ্যে দিয়ে সেই বিষয়গুলিকে বোঝানোর চেষ্টা করা হবে।

প্রথম অধ্যায়

দলিত আত্মকথার স্বরূপ সন্ধান : ইতিবৃত্তে চণ্ডাল জীবন ও আমার ভুবনে আমি বেঁচে থাকি

বর্তমান সময়ে দলিত সাহিত্যের চর্চা মূলত একটা ইনস্টিটিউশন বা প্রতিষ্ঠানের রূপ পেয়েছে। আর এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সম্পর্ক থাকে ঘটনার। জীব মাত্রেই পেটের ক্ষুধা মিটিয়ে বেঁচে থাকার চেষ্টা প্রতিটি জীবনের ক্ষেত্রে বড় ঘটনা। মানুষও এর অঙ্গীভূত। অন্যান্য জীবের থেকে মানুষের তফাৎ শুধু এইখানে যে তারা বাঁচার মধ্যে সম্মান খোঁজেন। ভারতীয় সমাজ পদ্ধতিতে একদল মানুষ যখন সম্মানের জীর্ণতর শয্যায় শয়ন করে নিজেদের প্রচণ্ড আহত মনে করেন, তখন সম্মানের জন্য সংগ্রাম হয়ে ওঠে তাঁদের জীবনের বড় ঘটনা। পেরিয়ারের[২] 'আত্মসম্মানের সংগ্রাম' এই প্রকারের ঘটনা যা আসলে পরিণতিতে রূপ পায় প্রতিষ্ঠানের। সমাজের নিম্নকুঠুরির মানুষের অবস্থানই আসলে একটা দ্বান্দ্বিকতা। আর সেই দ্বন্দ্ব বহুক্ষেত্রেই জন্ম দিতে পারে বিচ্ছিন্নতার। সাহিত্য তার সরস মাধুর্য দিয়ে বিচ্ছিন্নতা দূরে সরিয়ে দেয় দুহাতে। সুতরাং দ্বন্দ্বের সঙ্গে সমন্বয় সাধন সাহিত্যের প্রার্থিত পথ বলেই দ্বন্দের সঙ্গে সমন্বয় করে দলিত সাহিত্য পথ চলে। 'যে জাতির প্রতিষ্ঠান সমূহ যত বিচারমূলক পরীক্ষা-প্রসূত জ্ঞান দ্বারা স্থাপিত হয়, সেই জাতি তত উন্নতির শিখরে আরোহণ করে। অন্য কথায়, যে-জাতির মধ্যে যত বিজ্ঞানবাদ (rationalism) বিচার দ্বারা তাহার সমাজ গঠিত হয় সেই সমাজ তত বেশি উন্নত'।[৩]

প্রাতিষ্ঠানিক রূপের এই বিচারে দলিত সাহিত্যের উদ্ভব ও যাত্রা জাতির উন্নতি সূচিত করে। বর্তমান সময়ে সমাজের তলানির মানুষেরা তাদের অবস্থান বদলাচ্ছেন। এই স্থান বদলের মধ্যে আছে দ্বন্দ্ব। আর সেই দ্বন্দ্বকে আদর না করার মধ্যে আছে এক ধরনের ঈর্ষা। ঈর্ষা সর্বদাই উন্নতিকে প্রতিহত করে জাতিকে পিছনে টেনে নামায়। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় রবীন্দ্রনাথে ঠাকুরের সেই বিখ্যাত পঙক্তি –

যারে তুমি নীছে ফেল সে তোমারে বাঁধিবে যে নীচে,
পশ্চাতে রেখেছ যারে সে তোমারে পশ্চাতে টানিছে।
অজ্ঞানের অন্ধকারে
আড়ালে ঢাকিছ যারে

তোমার মঙ্গল ঢাকি গড়িছে সে ঘোর ব্যবধান।।[৪]

দলিত সাহিত্যে আছে সেই ব্যবধান মনস্কতা ঘুচিয়ে সাম্যের সন্ধান। আর এই সাম্যের খোঁজ করতে গিয়ে যখন একজন সাম্যবাদী ব্যক্তিমানব সমাজে বারবার অবমাননার স্বীকার হন। সেইসঙ্গে দেখা দেয় নিজের অস্তিত্বের সংকট। তখন তাঁদের কাছে একটাই হাতিয়ার থাকে নিজেকে তুলে ধরার তা হল ক্ষুরধার লেখনি। সেরকমই কয়েকজন অপমানিত, অবমানিত লেখকের লেখা 'আত্মজীবনী' তথা 'আত্মস্মৃতি'কে আলোচনার কেন্দ্রে রেখে আমার এই অভিসন্দর্ভটি গড়ে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে।

আত্মকথা

> আমি জানতাম আমি অচ্ছুত, আর তাই বিশেষ কিছু অসম্মান আর অসমতা আমাকে সহ্য করতেই হবে। যেমন, স্কুলে আমি আমার যোগ্যতা অনুসারে সহপাঠীদের সঙ্গে বসতে পারব না। আমাকে বসতে হবে ক্লাসঘরের একধারে, আলাদা একটি চটের আসনে। আমি জানতাম, স্কুলবাড়ি পরিষ্কার করার জন্য যাকে রাখা হয়েছে, সে ওই চটের টুকরোটা ছোঁবে না। আমাকে রোজ আমার আসন তুলে বাড়ি নিয়ে যেতে হবে; আর পরের দিন আবার নিয়ে আসতে হবে। স্কুলে উচ্চবর্ণের ছেলেরা জলতেষ্টা পেলে জলের কলে গিয়ে কল খুলে তেষ্টা মিটিয়ে নিতে পারত; বাইরে যাবার জন্য দরকার হতো শুধু শিক্ষকের অনুমতি। কিন্তু আমার অবস্থাটা ছিল আলাদা। আমি কল ছুঁতে পারতাম না। ছুঁত জাতের কেউ একজন কল খুলে না-দিলে আমি জলতেষ্টা মেটাবার সুযোগ পেতাম না। আমার ক্ষেত্রে শুধু শিক্ষকের অনুমতিই যথেষ্ট ছিল না। স্কুলের পিওনকে (শিক্ষকের নির্দেশে) সেখানে উপস্থিত থাকতে হতো।[৫] . . .

১. (ক) ইতিবৃত্তে চন্ডাল জীবন : মনোরঞ্জন ব্যাপারী

ইতিবৃত্তে চন্ডাল জীবন বর্তমান বাংলা সাহিত্যে একটি মূল্যবান আত্মজীবনীমুলক গ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত। এই গ্রন্থে মনোরঞ্জন ব্যাপারী তাঁর যে জীবনগাথা লিখেছেন তা তাঁর অসম সাহস ও আত্মবিশ্বাসের পরিচায়ক। মনোরঞ্জন ব্যাপারী কিছু মহামানব নন; তাঁর জীবনে এমন কিছু ঘটেনি যাতে পাঠকসাধারণের বিশেষ ঔৎসুক্য প্রকাশের কারণ থাকতে পারে। তিনি ছিলেন হতদরিদ্র, খেতে না পাওয়া

সাধারণ পরিবারের একজন মানুষ। তাঁর এই আত্মজীবনীতে ভয়াবহ দারিদ্র আর খেতে না পাওয়ার বিরুদ্ধে সেই বিদ্রোহ বার বার ফুটে উঠেছে। রিক্সা চালিয়ে যে মানুষের অন্নের সংস্থান করতে হয় তাঁর পক্ষে লেখাপড়া করার ভাবনাটা খুব সহজ ছিল না। কত কষ্টে তিনি যে একটু একটু করে পড়তে শিখেছিলেন তার বিবরণ তাঁর লেখাতেই আছে। তবু শুধু প্রাণের একান্ত বাসনায় সেই অল্পশিক্ষিত হতদরিদ্র ব্যক্তি একদিন লিখতে পড়তে শিখলেন। এবং এমন সহজ সরলভাবে তাঁর জীবনকথা ব্যাখ্যা করে গেছেন যাতে বিশেষ চিত্তাকর্ষক ঘটনা কিছু না থাকলেও পাঠকের মন মুগ্ধ হয়। তিনি অকপটে এমন কিছু তথ্য দিয়েছেন যা বিশেষভাবে পাঠককে ভাবায়-

> "এই বইখানি আমার নিজের লেখা; একান্তই নিজের জীবনের কথা; জীবনের সঙ্গে মানুষ ও সমাজের ধোঁকার কথা, আমি লেখাপড়া কিছুই জানি না। পাঠক মহাশয়েরা যেন অবহেলা না করে। অধিক বলা বাহুল্য"।[৬]

বস্তুত গ্রন্থটিতে জীবনের ঘটনাবলী এমন বিস্ময়জনক এবং লেখকের লেখায় এমন একটি অকৃত্রিম সরল মাধুর্য আছে যে গ্রন্থখানি পড়তে বসে না শেষ করে থাকা যায় না। মনোরঞ্জন ব্যাপারী স্বভাবতই ছিলেন সমাজ বিমুখ মানুষ। কিন্তু সেই সমাজ বিতৃষ্ণা বাইরের কোন আড়ম্বর প্রিয়তার জন্য নয় তা একান্তভাবে তাঁর জীবনের ঘাত-প্রতিঘাত থেকে উৎসারিত। এই বিষয়টি তাঁর গ্রন্থের প্রতিটি ছত্রে ছত্রে ফুটে উঠেছে। লেখক বা লেখিকার নামের আকর্ষণে অনেক সময় এমন কিছু কিছু গ্রন্থ আছে বিষয়বস্তু যাই হোক না কেন তা পাঠক সমাজের কাছে বিশেষ মূল্য পেয়ে থাকে। কিন্তু যেখানে সেরকম কোন আকর্ষণ নেই সেখানে সম্পূর্ণ লেখার ঔৎকর্ষের উপরেই তার মূল্য নির্ভর করে। মনোরঞ্জন ব্যাপারী নামের কোন আকর্ষণ পাঠক সমাজে নেই, কোন স্মরণীয় কাজও তিনি করেননি। তবু লক্ষ্য করার বিষয় এই যে মনোরঞ্জন ব্যাপারীর *'ইতিবৃত্তে চন্ডাল জীবন'* পাঠক সমাজের কাছে যেমন আকর্ষনীয় তেমনি একটি রক্তক্ষত-চিহ্নিত জীবন্ত দলিল হিসেবে পরিচিত।

প্রান্তিক মানুষের, গ্রামবাংলার নিম্নকোটির মানুষের তথা চন্ডাল জাতিগোষ্ঠীর মানুষের প্রকৃতির অমোঘ নিয়মে দরিদ্র হওয়ার ইতিহাস আবহকালের। সুদখোর, মহাজন, দাদনদারদের হাতে নিম্নশ্রেণীর মানুষেরা শোষিত হয়, নির্যাতিত হয়। আর সেই আর্থিক শোষণকে উপাদান হিসেবে ব্যবহার করেছেন মনোরঞ্জন ব্যাপারী তাঁর আত্মজীবনীতে। এর মধ্যে লেখকের যে সাফল্য আছে তার থেকে অনেক বড়

কথা হল জাতি-বিন্যস্ত ভারতবর্ষের দলিত মানুষের জীবন যন্ত্রনাকে তিনি 'ক্লাসিক' এ রূপান্তরিত করেছেন। এবং তা জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের কাছে গ্রহণীয় করে পরিবেশন করেছেন। সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তিনি যেভাবে লাঞ্ছনা বঞ্চনার স্বীকার হয়েছেন, সেই জায়গা থেকে সাহিত্য প্রচেষ্টা বলতে বাজার চলতি দু-একটি কবিতা ক্বচিৎ কেউ হয়তো লিখতে পারেন, কিন্তু দুদিন-তিনদিন না খেয়ে থাকা জীবন-কাটানো কোনো ব্যক্তির পক্ষে আত্মজীবনী লেখা চরম দুঃসাহসের কাজ। যা পাঠক সমাজে বিস্ময় ও শ্রদ্ধার উদ্রেক করে। অতিরিক্ত আবেগের কারণে জায়গায় জায়গায় মাত্রাহীন পুনরুক্তি প্রকাশ পেলেও তা বিরক্তির উদ্রেগ করে না। বরং পাঠককে আকৃষ্ট করে। সহজ ভাব আর সরল ভাষার মিশ্রণে সত্যিই মনোরঞ্জন ব্যাপারীর 'ইতিবৃত্তে চন্ডাল জীবন' গ্রন্থটি দলিত সমাজের আকড়। এমনকি লেখকের এই জীবনের টানাপোড়েন তথা ব্যাক্তিগত নিভৃতি ও একান্ততাই হয়ে উঠতে পারে বস্তুবিশ্বের প্রধান উপাদান।

নমঃশূদ্র জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে শোষণ প্রক্রিয়া চক্রাকারে চলে আসছে অনাদিকাল থেকে। শোষণের পাশাপাশি অস্পৃশ্যতার জীবনযাপন তাদের কাছে ছিল লজ্জাজনক। তাদের যেমন চাষবাসের জমি ছিল না, তেমনি তাদের কোন নির্দিষ্ট পেশাও ছিল না। রোদ হোক, বৃষ্টি হোক তাঁরা উচ্চশ্রেণির হুকুম মতো কায়িক শ্রম করত। অন্তহীন শ্রমের বিনিময়ে তাঁরা পেত পশুর মতো ব্যবহার। মনোরঞ্জন ব্যাপারী তাঁর 'ইতিবৃত্তে চন্ডালজীবন'-গ্রন্থে যে মূল জায়গাটা প্রত্যক্ষ করেন তার নাম হল প্রভুত্ববাদ। এই প্রভুত্ববাদীরা হলেন চিরকাল শোষক শ্রেণির প্রতিনিধি। আর তাই দলিত জাতিগোষ্ঠীর ওপর চেপে থাকা শোষকদের শোষণ প্রক্রিয়ার নাগপাশ থেকে মুক্তি একান্তই কাম্য। প্রান্তিক মানুষের জীবন ও তার সমস্যা, সমাজের মাতব্বর ও জোতদারদের অন্তহীন নির্মম শোষণ, শিক্ষায় ও আর্থিক বুনিয়াদ-এ তাদেরকে সবদিক থেকে কোণঠাসা করে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়। *'ইতিবৃত্তে চন্ডালজীবন'* গ্রন্থে একদিকে যেমন সেই ভয়াবহতা স্পষ্ট তেমনি অন্যদিকে সেই ভয়াবহতা থেকে মুক্তির বার্তাও স্পষ্ট। যেমন-

> যখন সাঁতার কাটতে কাটতে হাত পা খিল ধরে আসছিল মধ্যে মাথা চাড়া দিচ্ছিল ডুবে মরার নিদারুন ভয়, তখনই কার যেন গলা শুনেছিল, যে গলা বিপদে আপদের সময়- বারবার শুনেছে- সাহস হারাস না জীবন। মরার ভয়ে যেন মরে বসিস না। আশেপাশে কেউ কোথাও নেই, কারও

কোনও সহায়তা পাবার আশা কোরো না। কেউ তোমাকে এই মাঠের মাঝখানে, দিঘির জলে বাঁচাতে আসবে না। বাঁচতে হলে নিজের চেষ্টায় বাঁচতে হবে। সেই চেষ্টা কর-।[৭]

জন্ম মুহূর্তের এক অভিশাপ জর্জরিত মানুষ ছিলেন তিনি। দুহাত ভরে শূন্যতা ছাড়া আর কিছুই নিয়ে জন্মাননি। এই দেশ, সময়, মানুষ সবাই তাকে খালি হাতে ফিরিয়ে দিয়েছে বারবার। সবাই ঠকিয়েছে যার যেমন সাধ্য। তাই দীর্ঘদিন বাইরে বাইরে ঘুরে ঘুরে পাঁচ বছর পর যখন মায়ের সঙ্গে দেখা হয় মায়ের কাতর গলার প্রশ্নের উত্তরে লেখককে বলতে শোনা যায়-

ছিলাম তো নরকে, নরক যন্ত্রণা ভোগ করার জন্যে। এই পৃথিবীর মধ্যে যে বজ্রকন্টকশাল্মলী নরক রয়েছে যেখানে কৃমিকীটের মত মানুষ মানুষকে খুবলে খেয়ে হৃষ্টপুষ্ট হয়, আমি সেই নরকের বাসিন্দা হয়েছিলাম।[৮]

সমসাময়িক অজস্র মানুষকে দেখার অভিজ্ঞতা মনোরঞ্জন ব্যাপারীর আত্মজীবনীতে ভিড় জমিয়েছে। কখনও পার্টির নেতা, কখনও জেলের ভিতরের সর্দার আবার কখনও সমাজের মাতব্বরেরা। তাই তাঁর কণ্ঠে আক্ষেপের সুরে বলতে শোনা যায়-

মানুষ চেনা সত্যিই কঠিন। কে যে কী কিছু বোঝবার উপায় নেই। . . .আমার ভাগ্য আমাকে অল্প কিছু সময়ের জন্যে ওই মানুষগুলোকে সেইসময় জেলের বাইরে এবং জেলের ভিতরে খুব কাছ থেকে দেখার সুযোগ দিয়েছে।[৯]

"ভারতীয় সমাজে শ্রেণি যতটা বর্ণভিত্তিক ততটা অর্থভিত্তিক নহে"।[১০] যারা বর্ণগতভাবে দুর্বল তাঁরা অর্থনৈতিকভাবেও দুর্বল। ব্যতিক্রম যা চোখে পড়ে তা সংখ্যার বিচারে একান্তই নগণ্য। পক্ষান্তরে যারা বর্ণগতভাবে উঁচুতে তাঁরা অর্থনৈতিকভাবেও উঁচুতে। ভারতীয় সমাজে বর্ণবিভাজন প্রক্রিয়া মিশে আছে মানুষের অস্তিমজ্জায়, রক্তমাংসে। যুগ যুগ ধরে ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতায় বর্ণগতভাবে নীচে অবস্থানকারী কোনও মানুষ যদি অর্থগতভাবে সবল হয়ে ওঠেন তবুও তিনি সামাজিকভাবে শ্রদ্ধা এবং সম্মানের পাত্র হয়ে ওঠেন না। বর্ণগতভাবে উঁচুতে থাকা মানুষেরা দেশের সম্পদের মালিক এবং দেশের বা রাষ্ট্রের পরিচালন পরিকাঠামোর যে দুটি প্রধান শাখা যথা- শাসন ও বিচার তারও মালিক তাঁরা। সমাজবিজ্ঞানের নিরিখে ব্যক্তি বিলুপ্তি, গোষ্ঠী বিলুপ্তি ঠেকাতে গিয়ে যেমন 'সংরক্ষণ' প্রয়োগ করার প্রয়োজন পড়ে ঠিক সেই প্রকারেই ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে উঁচুনিচু অবস্থা, গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে উঁচুনিচু অবস্থা,

শ্রেণিতে শ্রেণিতে উঁচুনিচু অবস্থাকে ভেঙে দিয়ে সমতা গড়তে 'সংরক্ষণ'[১১] প্রয়োগ করার প্রয়োজন পড়ে। আর এই বিষয়টির কথা বলতে গিয়ে লেখকের ভেতরে এক ধরণের অসন্তোষ লক্ষ করা যায়। যা 'ইতিবৃত্তে চণ্ডাল জীবন' নামক এই আত্মজীবনীতে সুন্দর ভাবে ফুটে উঠেছে। তাঁর কথায়-বাবাসাহেব আম্বেদকর, গুরুচাঁদ ঠাকুর, পেরিয়ার রামস্বামী নাইকার মহাত্মা জ্যোতিবা ফুলে এদের প্রত্যেকের আশা এবং উদ্দেশ্য ছিল ব্রাহ্মণ্যবাদের পেষণ থেকে নিম্নবর্গ দলিত মানুষকে রক্ষা করা। সেই লক্ষ্যে তাঁরা আজীবন কঠোর এবং আপসহীন সংগ্রাম চালিয়ে গেছেন। তাঁদের সংগ্রামের সুফল চেটে পুটে খেয়ে কিছু মানুষ জোঁকের মত ফুলে ফেঁপে উঠেছে। এই লোকগুলি স্বজাতি দলিত লোকেদের কোন উপকারে আসে না। এরা মত্ত হয়ে আছে আরও অর্থ আরও সুখভোগ প্রাপ্তির তালাশে। নিজেকে ছাড়া নিজের পুত্র কন্যা পরিজন ছাড়া এরা কাউকে ভালোবাসে না। তাই এইসব লোক দলিত তাস খেলে বার বার সমাজের কাছ থেকে বাড়তি সুবিধা আদায় করে নেবে এ জিনিস চলতে দেওয়া অন্যায়। তিনি একথাও বলেন, বাবাসাহেব চাকরিতে সংরক্ষণের সুযোগ করে দিয়েছেন। তিনি আশা করেছিলেন, যারা আর্থিক দিক থেকে স্বাবলম্বী হয়ে উঠবে তারা নিম্নবর্ণ মানুষদের উন্নতির জন্য কিছু উদ্যোগ নেবে। তারা নিয়েছে অনেক কিছুই কিন্তু কেউ কিছুই দেয়নি। তাই বর্তমান সময়ের এইসব মানুষদের দেখে জীবনের শেষ প্রান্তে এসে তার গলা থেকে আক্ষেপ ঝড়ে পড়েছিল। এইসব শিক্ষিত মানুষ আমাকে ঠকিয়েছে সবচেয়ে বেশি। এইভাবে একের পর এক বিষয় উপস্থাপনে মনোরঞ্জন ব্যাপারী'র উক্ত গ্রন্থটি বাংলা সাহিত্যে এক ভিন্ন দ্যোতনা সৃষ্টি করছে।

মনোরঞ্জন ব্যাপারীর জন্ম হতদরিদ্র এক দলিত পরিবারে। তিনি এমন একজন ব্যক্তি যিনি নিজের জন্মতারিখ জানেন না। তাঁর গর্ভধারিনীও ছেলের জন্মের দিনটির কথা ঠিকঠাক বলতে পারেননি। আনুমানিক ১৯৫০ সালে বরিশালের পিরোজপুরের তুরুখালি নামক স্থানে তাপতপ্ত বৈশাখের কোনো এক রবিবারে তাঁর জন্ম। দেশভাগের ধাক্কায় তাঁদের ছিন্নমূল পরিবার যখন পশ্চিমবঙ্গে পাড়ি জমায় সে-সময়ে মনোরঞ্জনের বয়স তিন বছর। বার বার ঠাঁইনাড়া হতে হয়েছে তার পরিবারকে। উদ্বাস্তু শিবিরের মানবেতর পরিবেশে তিনি বড়ো হয়েছেন আরো অসংখ্য দেশহারা মানুষজনের সঙ্গে। ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাঁর পরিবারকে যেতে হয়েছে দণ্ডকারণ্যে। অল্পবয়স থেকেই মনোরঞ্জনকে জড়িয়ে পড়তে হয়েছে কঠিন জীবন সংগ্রামে। লেখাপড়া করার সুযোগ তাঁর হয়নি। জীবনে কখনো তিনি বিদ্যালয়ের চৌকাঠ ডিঙাতে

পারেননি। জীবনধারণের জন্য কত কী যে করতে হয়েছে তাঁকে, তাঁর সামান্য নমুনা পাওয়া যায় উদ্ধৃতাংশে-

> যেদিন আমাকে স্কুলে ভর্তি করার মনোবাসনা, তার দিন সাত আট আগে থেকে শুরু হয়েছিল তার প্রস্তুতি। বাবা চলে গিয়েছিলেন খুঁজতে কোথায় তালগাছ ও বাঁশঝাড় আছে। শিশুশিক্ষায় এই দুটোর অবদান অসামান্য। তালগাছ পেয়ে তরতর করে বাবা চড়ে গিয়েছেন তার মাথায়। আর সেখান থেকে বেছে বেছে নামিয়ে এনেছিলেন একগোছা তালপাতা। এরপর বাঁশ বাগানে গিয়ে কেটে এনেছিলেন দুখানা কঞ্চি।...এরপরে সেই শুভদিনে, সকালে আমাকে চান করিয়ে, কানের পাশ থেকে গড়িয়ে আসার মতো মাথায় চপচপে সরষের তেল দিয়ে চুল আঁচড়ে, নববস্ত্র পরিয়ে, এক বগলে বামুনে পৈতার মত দড়িবাধা একগোছা তালপাতা অন্য বগলে একবোতল ভুষিকালি, পকেটে কঞ্চির কলম, তালপাতা পোছবার জন্য জল ন্যাকড়া, বসবার জন্য ছোট চট, দুপুরে যখন খিদে লাগবে, অর্থাৎ টিফিন টাইমে খাবার জন্য খুদের নাড়ু, এসব দিয়ে আমার হাত ধরে বাবা আমাকে নিয়ে গেলেন স্কুলে। স্কুলটি আমাদের তাবু থেকে অতি সামান্যই দূরে। স্কুলে ঘন্টা বাজালে আমাদের তাবু থেকে শোনা যায়। বাবা চেয়েছিলেন আমার চোখে আলো জ্বালাবেন। স্কুলের সামনে পৌঁছে তাঁর সে আশার আলো দপ করে নিভে গেল। কারণ, স্কুল আর খুলবে না। আজ থেকে সব পড়াশোনা বন্ধ-।[১২]

মনোরঞ্জন ব্যাপারী ছিলেন সাম্যের পূজারি। সাম্যই পারে শোষণ থেকে, বঞ্চনা থেকে মানুষকে মুক্তি দিতে। বঞ্চনা ও শোষণের ধারা আবহমানকাল ধরে চলে এসেছে; এবং আর কতকাল যে চলবে তা কি কেউ ঠিক করে বলতে পারবে? ভারবর্ষে সাম্যের বেচাকেনায় রয়েছে অনেক খাদ। তার থেকে মুক্তি দেবে কে? এই প্রশ্নই জীবনে চলার পথে তাঁর মনে হয়েছে বারবার।

> মা বাবা ভাইবোন আত্মীয় পরিজন সবাইকে ছেড়ে এসেছি প্রায় পাঁচবছর। পশ্চিমবঙ্গ ছেড়ে বাইরে বাইরে ঘুরে বেড়ালাম যার মধ্যে দু বছর। দিনের পর দিন কিছু খাওয়া জোটেনি, চান হয়নি, ঘুম হয়নি। কখনও বিনা টিকিটে ট্রেন ভ্রমণের অপরাধে চেকারে ধরে নিয়ে গেছে, কখনও রেল পুলিশ চোর বলে নির্দয়ভাবে পিটিয়ে দিয়েছে। এক দুবার দুর্ঘটনায় পড়তে পড়তে বেঁচে গেছি। খিদের জ্বালা সহ্য করতে না পেরে একদিন একটা পাউরুটি চুরি করে নিয়েছিলাম এক

দোকান থেকে। প্রখর রোদের তাপে ঝলসে গেছে শরীর, বৃষ্টিতে ভিজতে হয়েছে কোথাও কোন ছাউনি না পেয়ে। শীতের কামড়ে কেঁপেছি আর কেঁদেছি সারারাত। এভাবেই চিনেছি পৃথিবীটাকে। কে যেন বলে গেছেন পৃথিবীটা গোল। এর যেখান থেকে যাত্রা শুরু করা যাক অনবরত চলতে থাকলে একদিন সেইখানে এসে যাত্রা শেষ হবে যেখান থেকে একদিন শুরু করা হয়েছিল। আমিও তো এই নিয়মের অধীন-।[১৩]

"ভারতে সাম্যবাদীর গলায় কৌলিন্যের দ্যোতক 'পৈতা' বাঁধা থাকলেও তা নিয়ে তর্ক বা বিতর্ক করে না কেউ"।[১৪] সাম্যবাদী হয়েও কৌলিন্য ভুলতে না-পারাটা অপরাধ বলে বিবেচিত হয় না। কিন্তু একজন দলিত মানুষের ক্ষেত্রে সাম্যের আন্দোলন করাটাই একটা অপরাধ। তাঁদের মুখে সাম্যবাদ বিষয়টাকে কেউ মেনে নিতে পারেন না। তাই দেখা যায় লেখক মনোরঞ্জন ব্যাপারী যখন সাম্যবাদের দাবি নিয়ে হাজির হন সমাজের কর্ণধারদের কাছে তখন তাকে অকারণে সইতে হয় পশুর মতো অমানবিক নিপীড়ন ও অত্যাচার। যা তার মনকে বিষিয়ে তোলে। আর তাই আমরা তাকে বলতে শুনি-

আমি এখন ভীষণ রকম স্বার্থপর হয়ে উঠেছি। বিশ্ব জগতের বিঘটন আমাকে বিচলিত করে ব্যথিত করে, কিন্তু সক্রিয় করে না। . . আগে আমি এদের হাতে অনেকবার মার খেয়েছি। কিন্তু এখন আমি অন্যমানুষ। যার একমাত্র উপাস্য শয়তান। যে শয়তান আমাকে শিখিয়েছে কোন ভয়ভীতির সামনে নত না হতে। মানুষ একবারই মরে, কাপুরুষ মরে বারবার। যে মানুষ মরতে ভয় না পায়, তাকে সবাই ভয় করে'।[১৫]

ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থায়-বঙ্গভূমির বাঙালি মননে, বিশেষ করে কলকাতা মহানগরীর মধ্যবিত্ত ভাবনায়, ছোটজাত, ছোটলোক, কায়িকশ্রম এই তিনটি শব্দ অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। যারা ছোটজাত তারাই ছোটলোক। আর ছোটলোক মানেই অস্পৃশ্য এই ধারণা ভারতীয় সমাজের উচ্চস্তরের মানুষের বদ্ধমূল ধরণা। সমাজ বিভাজনের কাঠামোয় ছোটলোক, ছোটজাত বলে প্রতিপন্ন হওয়ার ফলে "সারাদেশে এই অস্পৃশ্য জাতিগুলো কি ভয়ঙ্কর আক্রমণের শিকার হয়"।[১৬] এন. ডি কাম্বলে তাঁর 'দি সিডিউলড কাস্টস' নামক পুস্তকে তার দীর্ঘ বিবরণ দিয়েছেন। সেগুলো হল-

১। পরিবারগুলোকে ঘরের মধ্যে আটকে রেখে তাতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া।

২। লোকেদের আলাদা ভাবে বা একসঙ্গে পুড়িয়ে মারা।

৩। অস্পৃশ্যতার কারণে খুন।

৪। হিন্দু দেবতার সামনে তাদের বলি দেওয়া।

৫। ঘরে আগুন লাগিয়ে দেওয়া।

৬। দলিত নারীদের নগ্ন করে মারধোর করা ও তারপর প্রকাশ্য তাদের গ্রামে ঘোরান।

৭। তাদের কুয়োর জলে মলমূত্র নিক্ষেপ করা।

৮। তাদের কাজ থেকে ছাড়িয়ে দেওয়া এবং মৃত্যুভয় দেখানো।

৯। ক্ষেতের ফসল নষ্ট করে দেওয়া। এবং সর্বপরি

১০। নাগরিক হিসাবে তাদের অধিকার প্রয়োগ করতে বাঁধা দেওয়া, ব্যক্তি স্বাধীনতায় বাঁধা দেওয়া, খাওয়ার হোটেলে ঢুকতে বাঁধা দেওয়া। সাধারণের ব্যবহার্য কুয়ো থেকে জল নিতে বাঁধা দেওয়া, বিয়ের শোভাযাত্রায় বাধা দেওয়া এবং মন্দিরে ঢুকতে বাধা দেওয়া প্রভৃতি। এছাড়াও দলিতদের বিরুদ্ধে কি পরিমাণ হিংসাত্মক ঘটনা ঘটেছে এবং তাতে অপরাধীদের কি পরিমাণ সাজা হয়েছে তার একটি বিবরণ তুলে ধরলে বিষয়টি সহজেও অনুমান করা যাবে।

সারণী- এক

দলিতদের বিরুদ্ধে অপরাধের জন্য দায়ের হওয়া মামলা

সাল	১৯৯১	১৯৯৯-২০০০	২০০০-২০০১
মোট মামলা	৮০২৯	১১৫৮৭৮	১১৬১৩১
নিষ্পত্তি হওয়া মামলা	------	৮৬৭৩ (৭.৫%)	১২৯৫৬ (১১.২%)
সাজা হয়েছে	১২৫ (১.৬%)	৭০০ (০.৬%)	৯৮২ (০.৯%)
খালাস হয়েছে	১৩৬৭ (১৭.০%)	৭৪২০ (৬.৪%)	১১৬০৫ (১০.০%)
নিষ্পত্তি না হওয়া মামলা	৬৫৩৭ (৮১.৪%)	১০৭২০৪ (৯২.৫%)	১০০৮৯১ (৮৬.৯%)

সূত্রঃ ন্যাশনাল কমিশন ফর এস. সি / এস. টি ১৯৯১, ১৯৯৯-২০০০, ২০০০-২০০১।

এছাড়াও অস্পৃশ্যতার নানাবিধ প্রকাশ ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে এখনো প্রবলভাবে রয়েছে তামিলনাড়ুতে। তামিলনাড়ুতে পারাইয়ারা যেসব পুরানো পারাসেরিতে বাস করে সেগুলো উর থেকে দূরে তৈরি হয়। পারাসারিতে যারা বাস করে তাদের উর মন্দিরে ঢুকতে দেওয়া হয় না এবং শবদাহ ও অন্যান্য আচার অনুষ্ঠানে পুরানো বাধা নিষেধ মেনে চলা হয়। চায়ের দোকান এবং মদের ঠেকে দলিতরা ঢুকতে পারে কিন্তু তাদের জন্য আলাদা গ্লাস রাখা থাকে। যেন দলিতরা অন্যদের ব্যবহৃত গ্লাস ছুঁয়ে না দেয়। সাম্প্রতিক কালে কিছু পরিবর্তন সত্ত্বেও উচ্চবর্ণ এবং এমনকি পশ্চাদপদ জাতিগুলোও দলিতদের অত্যন্ত নিচু চোখে দেখে। পারাইয়াদের আচারগত ক্ষেত্রে অশুচি, অপবিত্র, অসভ্য ও সংস্কৃতিবিহীন রূপে দেখা হয়। দলিতদের সঙ্গে অন্যান্য জাতির বিবাহ প্রায় হয়ই না। গ্রামে এই ধরনের বিবাহ অনুমোদিত নয়। দলিতদের সামাজিক-অর্থনৈতিক অবস্থা এখনও খুবই নিম্নস্তরের।

খুন এবং প্রকাশ্য হিংসা ছাড়াও দলিতদের উপর নিঃশব্দে বহু পীড়ন চলে। এই পীড়ন দারিদ্র, ঋণগ্রস্ততা, বৈষম্য ইত্যাদির মাধ্যমে চলে এবং নারী শিশু বৃদ্ধ নির্বিশেষে দলিতরা নিপীড়নের শিকার হয়।

২. (ক) আমার ভুবনে আমি বেঁচে থাকি : মনোহরমৌলি বিশ্বাস

আত্মস্মৃতি বা আত্মকথা বা আত্মজীবনী, যে নামই দেওয়া হোক না কেন, বাংলা সাহিত্যে এই ধরনের রচনার কোন অভাব নেই। স্মৃতিধন্য সে-সব রচনার অধিকাংশই হল উচ্চমানের। কিন্ত নিম্নমধ্যবিত্ত সমাজের বাঙালি লেখকের লেখা আত্মজীবনী তথা আত্মকথা বাংলা সাহিত্যে খুব বিরল। মনোহরমৌলী বিশ্বাস তাঁর স্মৃতিকথা লিখেছেন 'আমার ভুবনে আমি বেঁচে থাকি' নামক গ্রন্থে। গ্রন্থটিকে লেখকের আত্মজীবনী বলা হলেও, লেখক কিন্তু একে খুব জোরালোভাবে আত্মজীবনী বলতে চাননি। সমগ্র গ্রন্থটি পাঠ করলে হয়তো সেকথাই বারবার মনে হবে। আলোচনার শুরুতেই লেখকের মন্তব্য কিছুটা উপস্থাপন করলে পাঠকের বুঝতে অসুবিধা হবে না, যে বাংলা দলিত সাহিত্যে মনোহরমৌলি বিশ্বাসের 'আমার ভুবনে আমি বেঁচে থাকি' কতটা আত্মজীবনী হিসেবে গ্রহণযোগ্য।

> প্রথমে আমি আমার আত্মচরিতের নামকরণ করেছিলাম 'পৃশ্মিকা'। পরে সেটাকে আরেকটু সংশোধন করে নিয়ে করেছিলাম 'পৃশ্মিকার জীবন ও মৃত্যু'। পৃশ্মিকা একটি অপ্রচলিত বাংলা শব্দ এবং এই অপ্রচলিত শব্দটির মানে কচুরিপানা। পরে ভেবেছিলাম সোজা করেই বইটির নামকরণ করে ফেলি- 'কচুরিপানার জীবন মৃত্যু'। শেষ মুহূর্তে নিজেকে কচুরিপানা ভাবতে কষ্ট হল। ভিতরে গড়ে ওঠা একটা গরিমা বোধ থেকে বোধ করি এমনটা হল। এই গরিমা'র সাথে কোনও অহংকার মিশে নেই। যা আছে তা হল মানুষের সত্তায় প্রতিষ্ঠিত হতে পারার তৃপ্তি। নিজেকে এই মুহূর্তে একজন মানুষ ভাবতে পারছি এই সুখ। এ-আমার এক আত্মসুখ।[১৭]

আত্মজীবনী হল সেই সরলতম সৃষ্টি, যা আদতে এক জটিলতম নির্মাণ। সরল কেননা, আমরা জানি যে একজন ব্যক্তি তাঁর নিজের জীবনের খবরাখবর সবচেয়ে বেশী রাখেন সে নিজেই। যিনি সেটা লিখছেন। যেমন যদি বলা হয় লক্ষ্মীপ্রিয়ার মৃত্যুর পর চৈতন্যদেবের অবস্থা কেমন, বাইরের দিক থেকে তার একটা বিবরণ বৃন্দাবন দাস শ্রীচৈতন্যের আত্মচরিত 'চৈতন্য ভাগবত'–এ দাখিল করেছেন।

পত্নীর বিজয় শুনি গৌরাঙ্গ শ্রীহরি।

ক্ষণেক রহিলা কিছু হেট মাথা করি।।

প্রিয়ার বিরহ দুঃখ করিয়া স্বীকার।

স্তব্ধ হই রহিলেন সর্ব বেদসার।।[১৮]

এছাড়া অতিরিক্ত কিছু বলা বৃন্দাবনদাসের এক্তিয়ারে নেই। অথচ একই পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নূতন বৌঠানের মৃত্যুতে তাঁর মনের মধ্যে কেমন উথাল-পাথাল ঘটছিল 'জীবনস্মৃতির' দৌলতে সে বিবরণ বাঙালি পাঠকের বেশ পরিচিত–

> "মৃত্যু যখন মনের চারিদিকে হঠাৎ একটা 'নাই'- অন্ধকারের বেড়া গাড়িয়া দিল, তখন সমস্ত মনপ্রাণ অহোরাত্র দুঃসাধ্য চেষ্টায় তাহারই ভেতর দিয়া কেবলই 'আছে'- আলোকের মধ্যে বাহির হইতে চাহিল"।[১৯]

অতএব আত্মজীবনীতে লেখকের অভিজ্ঞতার পর্যাপ্ত উপকরণ হাজির থাকে বলেই, আমরা আত্মজীবনীকে 'সরলতম' সৃষ্টি বলতে পারি। কিন্তু এবার আমার আলোচ্য প্রশ্ন মনোহরমৌলি বিশ্বাসের আত্মকথন 'আমার ভুবনে আমি বেঁচে থাকি' আত্মজীবনী হিসেবে কতটা সরলতম ?

অনেক দুঃখ কষ্টের মধ্যে দিয়ে পথ হাঁটতে হাঁটতে মনোহর নিজের মতো করে নিজেকে গড়ে নিতে থাকেন। এই নিজস্বতা গড়ে নেওয়ার, এই আপনত্ব প্রতিষ্ঠার, এই স্বকীয়তা লাভের, এই আত্মসত্তা নির্মাণের সাথে কখনও কোনও আপোষ করেননি তিনি।

গ্রন্থের ভূমিকায় তাই তিনি লিখেছেন-

> আমার ভুবনে আমি এভাবেই বেঁচে থাকি। আমার এ ভুবন দলিতদের নিরক্ষরতার ভুবন, আমার এ ভুবন দলিতদের দারিদ্রের ভুবন, দলিতদের হীন করে রাখার ভুবন, আমার এ ভুবন দলিতদের স্বাস্থ্যহীনতার ভুবন, অপুষ্টিতে শৈশব কাটানোর ভুবন, অপাংক্তেয়তার ভুবন, দ্বেষ-হিংসা-ঘৃণা-বঞ্চনার ভুবন, বহুজন মানুষের ধুকতে ধুকতে বেঁচে থাকার ভুবন।[২০]

এই আত্মজীবনীগুলি বাংলা সাহিত্যে অভিনব। এইসব স্মৃতিকথনের মধ্যে দিয়ে আমরা বহু মানুষ, সময় এবং ঘটনার বিচিত্রতা অনুভব করি। এদের কোনও পূর্বসূরি বা উত্তরসূরি নেই। বকলমে, এই গ্রন্থকে আত্মজীবনী বলা যাবে কিনা তা পাঠককেই ঠিক করে নিতে হবে। জীবনী অর্থে শুধু তাঁর ব্যক্তিগত জীবন নয়, তাঁর সঙ্গে সঙ্গে বা তাঁর চারপাশে যে সময়, যে যুগ, যে মানুষ, যে দেশ, যে ভবিতব্য

গড়ে উঠেছিল অথবা ভেঙ্গে যাচ্ছিল তাঁদের সবাইকে লেখক নিপুনভাবে তুলে ধরেছেন তাঁর 'আমার ভুবনে বেঁচে থাকি' গ্রন্থে। মনোহরমৌলি বিশ্বাস ব্যক্তিগত স্মৃতি, পরিচয়, পরিবেশ, এইসব দিয়েই তুলে ধরেছেন সেই সময়ের ইতিহাসকে। অপাংক্তেয় হওয়ার ক্ষোভ ছিল তাঁর প্রধান আয়ুধ। এজন্য যখন সমাজের কোনও 'গলদের' কথা বলেছেন সর্বদাই তাঁর মধ্যে একটা ঝাঁঝ রয়েছে। যেমন-

> একটা দেশ স্বাধীনতার ছয় দশক পার হয়ে যাওয়ার পরেও অস্পৃশ্যতার ক্লিষ্ট জোয়ালে একদা যারা এদেশে দৈন্যদশায় বন্দী হয়েছিল তাদের অবস্থার উল্লেখযোগ্য হেরফের হয়নি–হয়না এমন এক বেদনার মধ্য দিয়ে লিখলাম এই আত্মচরিত 'আমার ভুবনে বেঁচে থাকি' বুকের যন্ত্রণা নিয়ে। এ যন্ত্রনা ছোট করে রাখার যন্ত্রণা। এ যন্ত্রনা অপাংক্তেয়তার যন্ত্রণা –এ থেকে বেরিয়ে এসে আমার মানুষ যেন মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে, গৌরবের শিখর ছুঁতে পারে- এমন এক আশা, এমন এক প্রত্যাশার মধ্যে বেঁচে থাকি-।[২১]

এটা ঠিক যে, এই আত্মকথা তথা স্মৃতিচারণ সরাসরি তাঁর নিজস্ব জীবনের যতটা, তার চেয়ে বেশি হলো তাঁর নিজস্ব দৃষ্টিপাতের। জীবনকে তিনি যেমন দেখেছেন, যেভাবে দেখেছেন, যেমন অবাক হয়েছেন, যেমন মনখারাপ হয়েছে, সেইসব কথা ঠিক তেমনভাবেই বলেছেন। লেখকের কথায় তাঁদের স্বজাতি ছিল কাদাজলের মানুষ। কোনও প্রকার যত্ন ছাড়া কচুরিপানা বা পৃশ্নিকা যেমন কাদাজলে শৈশব পেরিয়ে আপনা-আপনি বড় হয়ে উঠত তাঁদের জাতিগোষ্ঠীর ছেলেমেয়েদের বেলায় তাই ঘটত। নৌকা-ডোঙার সাথে ভীষণভাবে পরিচয় ছিল তাদের। শিশুরা জন্মানোর পরে তাদের সাঁতার শেখানোর প্রয়োজন পড়ত না। নদীর জলের সাথে জীবনের এতই মিল ছিল যে অবচেতনভাবে এক আত্মীয়তার সম্পর্ক গড়ে উঠত। অলসতা বিষয়টা কী, তারা উপলব্ধিতে আনতে পারত না। আবার উল্টোভাবে দেখলে বোঝা যেত, 'বিশ্রাম'– এই শব্দটি তারা তেমন করে চিনতে পারত না। স্বভাবসিদ্ধ কায়িক শ্রমের সৈনিক তারা। না-পারার মত কোনও কিছু তাদের কাছে নেই। তেমন কোন শব্দও তাদের অভিধানে ছিল না। সহজাত স্বভাবে তারা পরিশ্রমী মানুষ। শ্রমই ছিল তাদের কাছে জীবনের আর এক নাম। তাই আজীবন শ্রমের সঙ্গে লড়াই করে জীবনের মানে খুঁজে নিয়েছিলেন তিনি।

এছাড়াও মগ্নচেতনার অভ্যন্তর থেকে কেমন করে একজন শিল্পী তাঁর পারিপার্শ্বিক বাস্তবতাকে দেখেছেন? কীভাবে সেই বাস্তবতাকে বিশ্লেষণ করেছেন পুরাণকল্পের আলো-আধারিতে। এবং তারপর

গড়ে তুলেছেন একান্ত নিজস্ব অভিনব রূপকল্প, যেখানে ঐতিহ্যের গভীর থেকে উঠে এসেছে জাতিগত আত্মপরিচয়। এসবই আমরা জানতে পারি মনোহর বিশ্বাসের আত্মজীবনী থেকে।

স্রোতের বিরুদ্ধে মনোহর বিশ্বাস :

ড. বি. আর আম্বেদকর তাঁর জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতায় এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থায় "The Caste-System controls everything- Education, Politics, sometimes Judiciary also"।[২২] প্রসঙ্গত শ্রী সত্যজিৎ রায় সৃষ্ট চলচিত্র 'সদগতি'-র হতভাগ্য দুখী চামারের কাহিনি উল্লেখ করা যায়। দুখী চামার যখন ব্রাহ্মণের বাড়িতে সারাদিন অসুস্থ শরীরে হাড়ভাঙ্গা খাটুনির পরে খিদের জ্বালায় খাবার না পেয়ে পাগলের মত নেশার কল্কেয় দীর্ঘ টান দিয়ে খিদে ভুলতে চায়, যন্ত্রণা ভুলতে চায়, চারপাশ ভুলতে চায়, এমনকি নিজেকেও ভুলতে চায়- সেই বিস্ফোরক দৃশ্য বিন্দুমাত্র কাল্পনিক নয়। এবং উপরোক্ত সিদ্ধান্তকেই সমর্থন করে।

১৯৩২ সালে বিলেতে অনুষ্ঠিত ঐতিহাসিক গোলটেবিল বৈঠকে ডঃ আম্বেদকর বলেছিলেন- 'Oppressed by the Hindus, suppressed by the British, disregarded by the Muslims we are left to such an utter helpless state of which there is no parallel in the world!!'[২৩]

মানব দরদী মহান কবি অধ্যাপক ডঃ মোহম্মাদ ইকবাল লিখেছিলেন-

আহ্ বদ্ কিসমত-
শূদর কে লিয়ে হিন্দোস্তাঁ গম্ খানা হ্যায়,
দর্দ-এ-ইনসানী সে ইস্ বস্তী কা দিল্
বেগানা হ্যায়।

(বঙ্গানুবাদ) : 'হায় দুর্ভাগ্য- শূদ্রদের জন্য হিন্দুস্তান এক দুঃখের দেশ, মানুষের কষ্টে যাতনায় নিঃসক্ত এ দেশের চিত্ত'।

ইতিহাসের এক ঘোর দুর্যোগের সময়ে এবং সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার অভিশপ্ত সন্ধিক্ষণে ১৯৪৩ সালের ৩রা অক্টোবর খুলনা জেলার প্রান্তিক গ্রাম দক্ষিণ মেটেরগাতীর ক্ষুদ্র চাষী পরিবারে মনোহর বিশ্বাসের জন্ম। কেউ কেউ সহানুভূতি দেখালেও শুরু থেকেই জীবনের চলার পথে পথে, পদে পদে বাধা,

অবজ্ঞা, অবহেলা, আঘাতে তাঁকে ক্ষত-বিক্ষত হতে হয়েছে। কিন্তু তিনি মনে প্রাণে বিশ্বাস করেন- "সঙ্কল্প ও আত্মবিশ্বাসে অটল পরিশ্রমী ও সত্যবাদীরা নিজেদের ভাগ্য নিজে গড়ে নেয়"।[২৪]

এক অতি দরিদ্র ঘরে জন্মে এবং ভয়াবহ দারিদ্রের সঙ্গে লড়াই করে বেঁচে থেকে আত্মজীবনী রচনা করে তাকে সাহিত্যের পর্যায়ে উন্নীত করার দৃষ্টান্ত বাংলা সাহিত্যে খুব কমই আছে। মনোহরমৌলি বিশ্বাস যে গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন সেখানে পাঠশালা ছিল না। তাঁর জন্মের দু-চার বছর পরে কয়েকজনের উদ্যোগে একটা পাঠশালা খুলেছিল। সেই পাঠশালা বসত একজনের গোয়ালঘরে। সময় হল দুপুরবেলা কেননা সেই সময় গোয়ালে গরুর উপস্থিতি থাকবে না। বাবা ও জ্যেঠার যৌথ সংসারে তাঁর লেখাপড়া শেখার কাজ শুরু হয়েছিল। শুরুটা হয়েছিল এক প্রকারের দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে। সেই দ্বন্দ্বের কথা বলতে গিয়ে লেখক লিখেছেন –

> বাবা বিশ্বাস করত, লেখাপড়া শিখলে আমাদের জীবনে নতুন যুগের সূত্রপাত ঘটবে- পৈর্তৃক-পেশায় বদল আসবে, জজ ব্যারিস্টার না হতে পারলেও উকিল মোক্তার হওয়া আটকাবে না। ...জ্যেঠার বিশ্বাস বাবার মত ছিল না; মুর্খ পরিবার থেকে লেখাপড়া শিখে কিছু হওয়া যাবে না, সেটাই বিশ্বাস করত জেঠা, যারা যোগ্যতা মাপবে তারা নিরক্ষরদের ঘরের ছেলেমেয়েদের মধ্যে যোগ্যতার অভাব খুঁজে পাবেই পাবে-।[২৫]

লেখকের কথায় তাঁর আত্মকথন আসলে একান্তই নিজের আত্মকথন। এই আত্মকথনের সাথে তাঁর স্ত্রী পুত্রের কোনও পরিচয় নেই। এ গ্রন্থটি সমাজে যারা স্বাভাবিকভাবে বেড়ে ওঠে তাদের পাশাপাশি মনোহর বিশ্বাসের অস্বাভাবিক হীন অবস্থা থেকে বেড়ে ওঠার দলিল। জীবনে হারিয়ে যেতে যেতে প্রান্তিক সীমানা ছুঁয়ে মানুষের মধ্যে পা রাখার দলিল। আসলে একটা 'ডকুমেন্টেশন'। বাগেরহাট পি. সি কলেজে আই. এস্. সি পড়তে পড়তে তিনি বুঝেছিলেন, অনাহারে আর অর্ধাহারে থাকা মানুষদের অনেকপথ হাঁটার ক্ষমতা থাকে না। কলেজে থাকাকালীন কেমিষ্ট্রি পরীক্ষার দুদিন আগে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন। কলেজের অধ্যক্ষকে আবেদন করে সিক-বেডে পরীক্ষা দিয়ে ফিরে গেলেন গ্রামের বাড়িতে। তার মাস খানেকের মধ্যে ওই অঞ্চলে প্রবল ঝড় হয়ে গেল এবং মাঠের ফসল নষ্ট হয়ে গেল। ঘরবাড়ি ভেঙে চুরে শেষ হয়ে গেল। সামনে এসে থাবা বিস্তার করে দাঁড়াল প্রবল দারিদ্র। নিরন্ন মানুষের কাছে ক্ষুধার যন্ত্রণার থেকে আর বড় কিছু নেই। এখানে সুকান্ত ভট্টাচার্যের সেই বিখ্যাত লাইন প্রযোজ্য। 'ক্ষুধার রাজ্যে

পৃথিবী গদ্যময়, পূর্ণিমার চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি'। সরকারি অনাদর আর উপেক্ষার মধ্যে দলিতদের অবস্থান অনন্তকালের। ছাত্রজীবনে তিনি মার্ক্সবাদের প্রতি ভীষণভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। কিন্তু সেই মার্কসবাদ সম্পর্কেও তার ক্ষোভ ছিল। যেমন-

> ছাত্রজীবনে মার্কসবাদের প্রতি ভীষণভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলাম। আমাদের দুর্ভাগ্য এখানে যে, মার্কসবাদীরা জাতিবাদের ঊর্ধ্বে উঠে কাজ করতে ব্যর্থ হয়েছিল। অতীতে যেমন ব্যর্থ হয়েছিল এখনও তারা ব্যর্থ। ভারতবর্ষে ড. বি আর আম্বেদকরের জন্ম না হলে আমাদের সন্তান-সন্ততিরা অতীতের প্রগাঢ় অন্ধকারের মধ্য থেকে বেড়িয়ে এসে বর্তমানকার আলোর পথে পা বাড়াতে পারত না'।[২৬]

এইভাবে আশাভঙ্গের মনস্তাপ নিয়ে পার হয়ে যায় সময়। একের পর এক লেখা হতে থাকে স্বপ্নভঙ্গের দিনলিপি। আমরা জানি দলিত সাহিত্যের শিল্পতত্ত্বের সঙ্গে প্রথাগত সাহিত্যের শিল্পতত্ত্বের মিল খুবই সীমিত। আজ পর্যন্ত ভারতবর্ষে যেসব সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে তার সঙ্গে দলিত সাহিত্যেরও কোন মিল এনেকটাই কম। কেননা এ সাহিত্য সবসময় বিদ্রোহের কথা বলে। বিদ্রোহ এই সাহিত্যের মূল প্রেরণা। তাই রূপ, রীতি, বিষয়, নন্দনতত্ত্ব সম্পর্কে চেতনার নিরিখে দলিত সাহিত্য পৃথক সাহিত্যের রূপ নেয়। ফলে দলিত শিল্পতত্ত্ব হয়ে যায় পৃথক। একথা অস্বীকার করার উপায় থাকে না যে, একই জিনিস ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখলে ভিন্ন মাত্রা পায়। এই ভিন্ন মাত্রা পায় বলেই সৃষ্টির নন্দনতত্ত্ব যায় বদলে। আবার মনোরঞ্জন ব্যাপারী, মনোহর বিশ্বাসের যে আত্মজীবনী তা যতটা ওই সমাজের অধিবাসীদের উদ্বুদ্ধ করেছে, বাবু সমাজের কাছে তথা যারা ওই জীবনে কোনদিন প্রবেশ করেনি তাদের কাছে তা ততটা আদৃত হয়ে উঠেনি। সৌন্দর্যের বোধ কোন অখন্ড, সার্বভূমিক, শ্রেণিউত্তীর্ণ, ঊর্ধ্বায়িত ও নির্বিশেষ ধারণা নয়, বরং তা শ্রেণিতে-শ্রেণিতে, গোষ্ঠীতে-গোষ্ঠীতে, সমাজে-সমাজে এমনকি হয়তো ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে কমবেশি পৃথক। আর এই পৃথকীকরণ ঠিক কীরকম এবং উঁচুনিচু ভেদে সৃষ্টির নন্দনতত্ত্বের পার্থক্য কোথায় তা এই অভিসন্দর্ভের দ্বিতীয় অধ্যায়ে আলোচনা করা হবে।

তথ্যসূত্র

১. সৈয়দ শাহিনুর রহমান, জন্ম ও পেশা ভিত্তিক বৈষম্য : আর্থ সামাজিক প্রভাব ও উন্নয়নের পথে, গ্রন্থ থেক উদ্ধৃত পৃষ্ঠা-২৩

২. পেরিয়ার ই. ভি. রামস্বামী নাইকার বিংশ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভারত সন্তান।

তামিল ভাষায় পেরিয়ার শব্দের অর্থ হলো 'মহামানব'। তিনি এখনও তামিলনাড়ুর একজন প্রবাদ পুরুষ। তিনি ভারতের অভিশাপ ব্রাহ্মণ্যবাদের বিরুদ্ধে সবচেয়ে শক্তিশালী অব্রাহ্মণ আন্দোলন দ্রাবিড় কাজাঘাম আন্দোলনের জনক। তিনি ভারতের বৃহত্তর জনসাধারণ শূদ্রদের (যাঁদের সংখ্যা মোট জনতার ৫২%) মধ্যে যে দাসমনোভাব বিরাজ করছে তা দূর করে তাদের মধ্যে আত্মমর্যাদাবোধ জাগানোর জন্য আমরণ চেষ্টা করে গেছেন। তাঁর ত্যাগ ও কোরবানীর ফলেই ভারতে প্রথম অব্রাহ্মণ শাসন কায়েম হয়।

৩. এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার রয়েছে : ভি গীথা, "পেরিয়ার, উইমেন এ্যাণ্ড এন এথিক অফ সিটিজেনসিপ", সম্পা. মৈত্রেয়ী চৌধুরী, ফেমিনিজম ইন ইন্ডিয়া, নিউ দিল্লি : ২০০৬, পৃষ্ঠা-১৫৬, ১৭৪

৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, গীতাঞ্জলি : হে মোর দুর্ভাগা দেশ. কলকাতা : ইন্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস, ১৩২০, পৃ- ১২৪

৫. ড. বি আর আম্বেদকর : 'অটোবায়োগ্রাফিক্যাল নোটস', নবায়ন, ২০০৩, পৃ- ১১

৬. মনোরঞ্জন ব্যাপারী, ইতিবৃত্তে চণ্ডাল জীবন. কলকাতা : দে'জ, ২০১৬, 'ভূমিকা', পৃষ্ঠা-১৫

৭. তদেব. পৃ- ৯৫

৮. তদেব. পৃ- ১১৩

৯. তদেব. পৃ- ২০২

১০. যতীন বাগচি, জাতি-ধর্ম ও সমাজ বিবর্তন. কলকাতা : বি সরকার. ১৯৮৬, প্রথম সং, পৃষ্ঠা-১৪

১১. দেবী চ্যাটার্জী, মানবাধিকার ও দলিত. কলকাতা : ক্যাম্প, জানুয়ারী-২০১৪

১২. মনোরঞ্জন ব্যাপারী, ইতিবৃত্তে চণ্ডাল জীবন. কলকাতা : দে'জ, ২০১৬, 'ভূমিকা', পৃষ্ঠা- ১১১

১৩. তদেব. পৃষ্ঠা- ১২৩

১৪. মনোহরমৌলি বিশ্বাস, প্রবন্ধে প্রান্তজন অথবা অস্পৃশ্যের ডাইরি. কলকাতা : চতুর্থ দুনিয়া, ২০১০

১৫. মনোরঞ্জন ব্যাপারী, ইতিবৃত্তে চণ্ডাল জীবন. কলকাতা : দে'জ, ২০১৬, 'ভূমিকা', পৃষ্ঠা- ১২৩

১৬. এন. ডি. কাম্বলে. দি সিডিউলড্ কাস্ট'স. নিউ দিল্লি : আশীষ পাবলিশিং হাউস, ১৯৮২, পৃ- ৪৬

১৭. মনোহর বিশ্বাস, আমার ভুবনে আমি বেঁচে থাকি. কলকাতা : চতুর্থ দুনিয়া, ২০১৩, পৃষ্ঠা- ১৪

১৮. বৃন্দাবন দাস. 'চৈতন্যভাগবত' : আদিখন্ড দ্বাদশ অধ্যায়. কলকাতা : দেব সাহিত্য কুটীর প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১৩, পৃষ্ঠা- ১০১

১৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, জীবনস্মৃতি : মৃত্যুশোক অধ্যায়. কলকাতা : বিশ্বভারতী, ১৪২৪, পৃষ্ঠা- ১৫১

২০. মনোহর বিশ্বাস, আমার ভুবনে আমি বেঁচে থাকি. কলকাতা : চতুর্থ দুনিয়া, ২০১৩, পৃষ্ঠা- ১৫

২১. তদেব. পৃষ্ঠা- ১৫

২২. ডঃ বাবাসাহেব আম্বেদকার. রাইটিংস অ্যান্ড স্পিসেস. সম্পা: বসন্ত মুণ, বোম্বে, খন্ড-১৪

২৩. তদেব.

২৪. মনোহর বিশ্বাস, যুক্তিবাদী ভারতবর্ষ : একটি ঐতিহ্যের সন্ধান, কলকাতা : ১৯৯৮, চতুর্থ দুনিয়া, পৃ- ১১৩

২৫. মনোহর বিশ্বাস, দলিত সাহিত্যের রূপরেখা, কলকাতা: বাণীশিল্প, ২০০৭, পৃষ্ঠা-৬২

২৬. মনোহর বিশ্বাস. আমার ভুবনে আমি বেঁচে থাকি. কলকাতা : চতুর্থ দুনিয়া, ২০১৩, পৃষ্ঠা- ১৫

দ্বিতীয় অধ্যায়

সমাজ বাস্তবতার দুই মেরু থেকে উঠে আসা দু-ধরনের সাহিত্যে লেখকের অভিজ্ঞতার নান্দনিক পার্থক্য ও তুলনামূলক আলোচনা।

নন্দনতত্ত্ব বা সৌন্দর্যতত্ত্বের আলোচনা বহুপ্রাচীনকাল থেকে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দেশে আলোচিত হয়ে এসেছে। এর উৎপত্তি শিল্পসৃষ্টির প্রথম তৎপরতার সমসাময়িক। শিল্প হল মানবমনের আনন্দিত উপলব্ধির বহিঃপ্রকাশ। আর সেই শিল্পকে সৌন্দর্যের নানা দৃষ্টিকোণ থেকে পরীক্ষা বা ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করা হয় যে শাস্ত্রে, তাই-ই হল 'নন্দনতত্ত্ব'। শুধুই কি আনন্দ উপলব্ধি? বেদনা থেকে কি শিল্প জন্ম নিতে পারে না ? বলব, অবশ্যই পারে। কিন্তু সে বেদনার প্রকাশেও এক ধরনের আনন্দ থাকে, যন্ত্রণা থেকে এক ধরনের মুক্তি। নন্দন তত্ত্বের 'তত্ত্ব' শব্দটিতে প্রচলিত অর্থে তাত্ত্বিকতার আভাস থাকলেও প্রকৃতপক্ষে একজন নন্দনতাত্ত্বিক শিল্পকে কোনো বাঁধাধরা নিয়মে যাচাই করতে পারেন না। শিল্পের প্রধান পরিচয় শিল্প। একটি শিল্প এবং শিল্প মাত্রই এক অর্থে স্বতঃস্ফূর্ত। নন্দনতত্ত্বের ইংরেজি প্রতিশব্দ হল 'Aesthetics'। মূলশব্দটি গ্রীক ভাষা থেকে উদ্ভূত। 'Aisthesis' শব্দের অর্থ One who perceives অর্থাৎ যিনি প্রত্যক্ষ করেন। তাই বলা যায় Aesthetics মানে প্রত্যক্ষণ শাস্ত্র অর্থাৎ দেখা। প্রাচীন সংস্কৃতে যাকে বলা হত বীক্ষাশাস্ত্র। অতএব আমার এই আলোচনায় মূলত দলিত সাহিত্যে তথা দলিত আত্মজীবনীগুলিতে লেখকের সেই দেখার ধরণ, আরো একটু তলিয়ে বললে বলা যায় কীভাবে দেখা ? কি জন্য দেখা ? তাই ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করা হয়েছে।

দলিত সাহিত্য ও তার নান্দনিকতা নিয়ে কেউ কেউ বলেছেন, শিল্পই হল সাহিত্যের মূল বিষয়। সেই অর্থে তাঁদের ধারণা বাংলা দলিত সাহিত্যে এখনও কোনও সুস্পষ্ট নন্দনতত্ত্ব গড়ে ওঠেনি। এই প্রসঙ্গে আমেরিকান কবি জেমস এ এমানুয়েলের (১৯২১-২০১৩) 'ডার্ক সিম্ফোনী'র একটি কথার উল্লেখ করা প্রয়োজন। তা হল, সাদা চোখ দিয়ে কালোকে দেখা আর কালো চোখ দিয়ে কালোকে দেখার মধ্যে বিস্তর ফারাক। আমরা জানি যে, চিরাচরিত সাহিত্যের ধারা আলোচিত হয় 'আর্টস ফর আর্টস সেক' (art for art's sake) –এই সেন্স বা ধারণাকে কাজে লাগিয়ে। কিন্তু দলিত সাহিত্যের মধ্যে যে Aesthetics আছে

তা হল 'আর্টস ফর লাইফস সেক' (art for life sake) এই এথিকসকে কাজে লাগিয়ে। এই এথিকসের মধ্য দিয়ে দলিত সাহিত্যের মধ্যে যে Aesthetic বা নন্দনতত্ত্ব খুঁজে পাওয়া যায় তা স্পষ্ট করে বোঝা যাবে সুনীল কুমার দাসের লেখা 'আনফিট' নামক ছোটগল্পটি থেকে একটি উদাহরণ দিলে।

দলিত সমাজের এক বাউড়ি-ঘর থেকে উঠে আসা একজন গল্পকার হলেন সুনীল কুমার দাস। তাঁর উক্ত গল্পে দেখা যায় প্রধান চরিত্র হচ্ছে পিতা রাহু এবং পুত্র হারান। প্রবল দারিদ্রের চাপ মাথায় নিয়ে হারান প্রাইমারি স্কুল থেকে কলেজের গণ্ডী পর্যন্ত পার হয়ে যায়। হারানের পিতা রাহু হলেন কোলিয়ারির একজন শ্রমিক। কোনও একসময় হারানের পিতা অসুস্থ হয়ে পড়েন ক্ষয়রোগে। অসুস্থতার জন্য তিনি একটানা দুবছর কাজে যোগ দিতে পারেন না। এইসময় ছেলের টিউশনির পয়সায় সংসারে একবেলা খাবার জোটে। রাহু মাঝে মাঝে কোলিয়ারির মেডিক্যাল বোর্ডের সামনে হাজির হন 'আনফিট' ঘোষিত হবার প্রত্যাশা নিয়ে। কারণ মেডিকেল বোর্ড রাহুকে 'আনফিট' ঘোষণা করলে রাহুর জায়গায় তাঁর পুত্রের চাকরী হবার কথা। হারান যখন অন্যত্র কিছু জোগাড় করতে পারছে না তখন নিদেনপক্ষে রাহুর চাকরিটা পেলে কোনমতে তাদের সংসারটা বাঁচে। মেডিকেল বোর্ডের 'আনফিট' হতে গোপনে দশ থেকে বারো হাজার টাকা ঘুষ দিতে হয়। রাহুর সেই সম্বল নেই। অপরপক্ষে যার তিন ছেলে চাকরি করেন এমন একজন সুস্থ ব্যক্তি 'আনফিট' পান এবং নিজে আনফিট ঘোষিত হয়ে সে জায়গায় শ্যালকের চাকরির ব্যবস্থা করে নেন। এই পর্যন্ত এই গল্পটির মূল যে এথিকস তা আমাদের প্রথাগত এথিকসকে উল্টোমুখে ফিরিয়ে দিয়েছে। সুনীলকুমার দাসের এই গল্পটি থেকে বোঝা যায় যে চাকরি পাওয়ার ব্যাপারে সমাজে এমন কিছু বিষয় আছে যা সাধারণত নিম্নবর্ণের মানুষ শিক্ষিত হয়েও কাটিয়ে উঠতে পারেন না। তাই তাঁদের শিক্ষিত ছেলেও বেকার থাকে। এই গল্পটি থেকে তাই স্পষ্ট বোঝা যায় দলিত সাহিত্যের একটি নিজস্ব এথিকস্ আছে।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উপন্যাস তথা কথাসাহিত্য নিয়ে এযাবৎ অনেক বেশি আলোচনা হয়েছে। কিন্তু বাংলা দলিত সাহিত্য নিয়ে আলোচনার পরিসর খুবই সীমিত। কেননা সাহিত্যের এই নতুন ধারা খুব বেশি পুরানো নয়। বাংলা সাহিত্যে এই ধারা পাঠকের চোখে প্রথম লক্ষিত হয় আটের দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে। ১৯৭৮ সালে দলিত সাহিত্য সম্ভ্রমের আসনে প্রতিষ্ঠিত হয়। অনেক বই লেখা হল, সাময়িক পত্র, দলিত সাহিত্য সম্পর্কে বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হতে লাগল। অনেক দলিত লেখক রাষ্ট্রীয় পুরস্কারে

ভূষিত হলেন। দলিত সাহিত্য বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় অনূদিত হতে লাগল। নগর, জেলা ও গ্রামে ছড়ানো সমস্ত নতুন লেখকরা লক্ষণীয় হয়ে উঠলেন এবং প্রকাশকরা দলিত সাহিত্য প্রকাশের জন্য আগ্রহী হয়ে উঠলেন। দলিত সাহিত্য আন্দোলন ভারতের অন্যান্য জেলা ও ভাষার মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল। সেই দিক থেকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে দলিত লেখকের সক্রিয় আন্দোলন খুব বেশি দিনের নয়। এখানে যে আন্দোলনের কথা বলা হচ্ছে তা হল সচেতন আন্দোলন। 'সচেতন' মানে, দলিত মানুষের মধ্য থেকে যারা তাঁদের জীবনবোধ নিয়ে, নিজস্ব আইডেনটিটির (Identity) খোঁজ তালাস নিয়ে সাহিত্যে এসেছেন তাঁরা সচেতন ভাবেই এসেছেন।

আবার অন্যদিকে বাংলা ভাষা সাহিত্যের অনুপুঙ্খ ইসিহাসকে সামনে রাখলে দেখা যায় যে, দলিত সাহিত্য ভাবনার সূক্ষ্ম বীজ লুকিয়ে ছিল চর্যাপদের কাল থেকে। কারণ চর্যাপদের অনেক কবি-ই ছিলেন অস্পৃশ্য সমাজের অধিবাসী। তাঁদের লেখায় দলিত মানুষের জীবনধারা স্থান পেয়েছে। উদাহরণ হিসেবে আমরা যদি শবরী পাদের কথা বলি তাহলে দেখব যে, কবি শবরেশ্বর শবরীপাদ তার কবিতায় বললেন-

"উঁচা উঁচা পাবত তহই বসই শবরবালী।
মোরঙ্গী পীচ্ছ পরহীন গীবত গুঞ্জর মালী"।[২]

দেখা যাচ্ছে এই কবিতায় রাঢ় বাঙলার পাহাড়ি অঞ্চলের একটি শবর কন্যার কথা সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। কবি নিজেই ছিলেন শবর তাই শবর কন্যার কথা এতো প্রানবন্ত। দলিত সাহিত্যের মূল স্ট্রাকচার বা কাঠামো অনুসারে এই লেখাটি কি দলিত কবিতা নয় ? অবশ্যই এটি দলিত কবিতা। এবার আমার আলোচনার বিষয় দলিত সাহিত্যের নন্দনত্তত্ব কোথায়? কি সেই নন্দনতত্ত্ব বা Aesthetics?

কোন একজন ব্যক্তি যখন দলিত অবস্থার মধ্যে জন্মান তখন সেই ব্যক্তি দলিত সমাজের অন্তস্তলের নান্দনিকতার মূল সুরটি সহজেই ধরতে পারেন। বাইরে থেকে সেই মূল জায়গায় পৌঁছতে অসুবিধা। উদাহরণ হিসেবে সর্বপ্রথম উল্লেখ করা যেতে পারে, অদ্বৈত মল্লবর্মণের লেখা 'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসের কথা। প্রশ্ন আসতে পারে 'তিতাসের' আগে কি দলিত লেখকেরা লিখতেন না? অবশ্যই লিখতেন, তবে জোরালো ভাবে দলিত লেখকের কথা আলোচনা করতে হলে 'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসকে রাখতেই হয়। তাই দলিত সাহিত্যের নন্দনতত্ত্বের আলোচনা করতে হলে এই

উপন্যাসের আলোচনা করা আবশ্যিক। কোন একসময় সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় অদ্বৈত মল্লবর্মণের 'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসকে অভিধা দিয়েছিলেন 'নদীর পাঁচালী'র। যখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর বাঙালি মধ্যবিত্ত মানসে আশাভঙ্গের বহুমাত্রিক আঘাতে নেমে এসেছিল এক শূন্যতা বোধ, এক অবসন্নতা তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল, তখন চেনা দিক সীমার ওপারে গিয়ে একটি নতুন দিগন্ত খুঁজে নেবার প্রয়াস প্রবল হয়েছিল। এমনটাই ছিল তাঁর সেদিনকার বিশ্বাস। বর্তমান সময়ে তিনি তাঁর পুরাতন বিশ্বাস বদলে নিয়ে বলেছেন-

> "এখন আমি দেখতে পাই, 'তিতাস একটি নদীর নাম' এবং তার স্রষ্টার অচ্ছেদ্য অন্বয়ের নিগূঢ় যোগাযোগ"।[৩]

প্রকৃতির মধ্যে মানুষ জন্মায়, সামাজিক পরিবেশের মধ্যে মানুষ জন্মায়। মানুষ প্রকৃতিকে সুন্দর করে, পরিবেশকে দান করে অমরত্ব। মানুষ হচ্ছে অন্তর্দর্শী, চিন্তাশীল, আত্মসচেতন জীব। আমরা প্রত্যেকেই জানি, সকল জাতির সকল-মানব গোষ্ঠীর জীবনচর্যায় স্বকীয় অর্থবহ ভিত্তি আছে। আর ভিত্তি আছে বলেই এদেশের সবচেয়ে পিছনের সারির মানবগোষ্ঠী তথা দলিতরা সংস্কৃতির দৈন্যতায় ভুগেও কারো কাছে মাথা নোয়ায় না। অন্ত্যজ সমাজের মানুষের জীবন চর্যার অনেককিছু আধুনিক সভ্যতার আলোকে দিন দিন অর্থবহ হয়ে উঠেছে।

দলিত সাহিত্যের নন্দনতত্ত্বের কথা বলতে গিয়ে এখন বিভিন্ন সাহিত্য সমালোচকদের মুখে যে কথাটি বারবার শোনা যায় তা হল- কোনও ব্যক্তি, তা সে তিনি যত বড়ই শিল্পী হোন না কেন, বাইরে থেকে গিয়ে 'ইতিবৃত্তে চন্ডাল জীবন' অথবা 'তিতাস একটি নদীর নাম' লিখতে পারা খুব সহজ নয়। লিখলেও হয়তো তা ততখানি প্রাণবন্ত হবে না কখনই। কাহিনী ও কাহিনীকার দুজনকেই সুনির্দিষ্ট জল মাটি হাওয়া থেকে, সেখানকার সংস্কার থেকে, বিশ্বাস থেকে, জীবন ও জীবিকার ঘাম কাদা মেখে এবং ছেনে উঠে আসতে হয়। বিষয় ও ব্যক্তিগুলি তাঁর কাছে দীর্ঘকাল ধরে অপ্রত্যক্ষেও হয়ে থাকে তারপরে একসময়ে তার প্রকাশ অনিবার্য হয়।

বলা যায় দলিত সাহিত্য এক প্রকারে বোবা মুখের ভাষা। এই সাহিত্যের তরঙ্গ মানুষের চিত্ত-কুলে আছড়ে প'ড়ে এক নব দ্যোতনা সৃষ্টি করে। তার ডানার সঞ্চালনে ভিতরের সুশান্ত অবস্থাকে মন্থন করে জাগিয়ে তুলতে চায়, যার ভিন্ন নাম চেতনা। দারিদ্রের সঙ্গে জড়িত ও গ্রন্থিত জীবন এই ধারার

কোন ব্যতিক্রম নয়। এ কেবল জীবনের নির্মোহ 'ক্লাসিকস' নয়, এর সঙ্গে আছে আরো অনেক কিছু। ভিতরের বহু অদৃশ্য আবরণ ভেঙ্গে বেরিয়ে আসা এক অনুক্ত ক্রন্দন, অব্যক্ত ইতিহাস। চাপা আগুনের এক নির্মাণ। প্রাসঙ্গিককভাবে এখানে ইংরেজি শব্দভাণ্ডার থেকে দুটি শব্দের কথা বলা যেতে পারে। 'সিমপ্যাথি' এবং 'এমপ্যাথি'। সিমপ্যাথি মানে সহানুভূতি আর এমপ্যাথি মানে সমানুভুতি। এ তো চিরকালীন সত্য, কোন বিষয় বা বস্তু সহানুভূতি দিয়ে যতটা স্পর্শ করা যায়– সমানুভুতির স্পর্শ আরো গভীর, আরো মমতা মাখানো। তাই মানুষের চেনা পরিবেশ দলিত লেখকদের কলমে আরো সজীব হতে পেরেছে একথা ভীষণ, ভীষণ জোর দিয়ে বলা যায়।

আলোচক মাত্রেরই স্মরণে রাখা প্রয়োজন, আজ ইতিহাসের ধারা বদল হয়েছে। সেইসঙ্গে বদলে গেছে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি। সাহিত্য ও সংস্কৃতির আলোচনা বা পর্যালোচনার ক্ষেত্রেও সেই মনস্কতা লক্ষ্যনীয়। বাংলা সাহিত্য তার অনন্তকালের ঐতিহ্যকে অনুসরণ করে ব্রাহ্মণ্যধারাকে করে রেখেছে আপন। আমরা জানি ধর্মশাস্ত্রগুলির হওয়ার কথা ছিল সবচেয়ে বেশি নিরপেক্ষ। কেননা এই ধর্মশাস্ত্রগুলিকে আঁকড়ে মানুষ সঠিক পথ অনুধাবনের চেষ্টা করে। কিন্তু তা কতটা নিরপেক্ষ বলার অপেক্ষা রাখে না। এর পেছনে বিদিত কারণ রয়েছে। ব্রাহ্মণেরা ধর্মশাস্ত্রগুলির প্রণেতা। ভাষ্য, অভিভাষ্যও তাঁদের লেখা। ব্রাহ্মণ্যধারাকে কেন্দ্রে রেখে এই ধর্মশাস্ত্রগুলির ব্যাখ্যা করা হয়েছে। কিন্তু যথার্থতা হারিয়ে তা হয়ে পড়েছে একপেশে। এর উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে অনন্তকাল থেকে চলে আসা সমাজে বর্ণ-বিভাজনের কথা। সমাজকে কি নিষ্ঠুর ও কঠোর হাতে বিভাজিত হতে হয়েছে। অতীতের সেই সৃজন ও ঐতিহ্যগত ধারা নিয়ে চলে আসছে যুগ যুগ ধরে। দলিত জনগোষ্ঠীর বিস্তারে আর বিলুপ্তিতে দেশে দেশে নদী এক অন্যতম নিয়ন্ত্রকের ভূমিকা পালন করে এসেছে। নদীকূলের দলিত অবহেলিত মানুষেরা সে-সত্য অকপটে জানে। যেমন সেই সত্য মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছিল দলিত সমাজেরই এক প্রতিনিধি স্রষ্টা অদ্বৈত মল্লবর্মণ। আর তাই তাঁর লেখা 'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসে তিতাস কূলের মানুষের চেহারা তাঁর কলমে এইভাবে উঠে আসে-

> তোমার আমার চেহারা কালো। তোমার আমার মা-ভইনে'র শরীরের যত্ন নাই। তারা সোনার মতো কান্তি ধরে। তাদের বউ-ভইনেরা রূপে টুক টুক করে। কাপড়ে-চোপড়ে গয়নাগাটিতে রূপে জৌলুসে তারা এক একজন দুর্গা মা। আলাদা হইয়া যায় আর দশজনের থেকে। তখন তারা কি

করে জান? তোমার মত জাল্লার নাউ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, জাল ইন্দুরে খাইয়াছে, ঢাকা নাই, বউ বাচ্চা লইয়া উপোষ করিবে, নদীতে নামিতে পারিবে না। তমসুক লেখাইয়া আন টাকা। ভিটাখানি কিন্তু বন্ধক থাকিল। সেই একবার আনিয়াছ কি ডুবিয়াছ। আসল টাকা তোমার জন্মেও শোধ করিতে পার না, সুদ দিতে জীবন শেষ। এইভাবে তারা কত লোকের জমি নিলাম করিয়াছে, কত লোকের নাও জাল কাড়িয়া নিয়া আরেক মালোর কাছে বেচিয়া দিয়াছে? এইভাবে তারা বড়লোক হইতেছে। দশটাকা দিয়া পঞ্চাশ টাকা আদায় করিয়াছে। কত জনার বুক ভাঙিয়াছে, কত জনার ভিটা গেছে, ক্ষেত গেছে, সর্বস্ব গেছে। আর তারা কি হইতেছে? বড় লোক, আরো বড় লোক। এমন বড় লোক মালোগুলির মধ্যে কোন কালে ছিল না"।[৪]

আধুনিক হিন্দুমনের আড়ালে ব্রাহ্মণ্য তন্ত্রের যে ঘন ছায়া তা কালান্তরে কিছুটা বিবর্ণ এবং ফ্যাকাসে হয় মাত্র। তার অস্তিত্ব অবিদ্যমান হয়েছে এমনটা বলা যায় না। বৈদগ্ধ মার্জিত এই জগতের নীচে নিম্নবর্ণের যে বৃহৎ জনগোষ্ঠী শতাব্দীর পর শতাব্দী পার হয়ে এল, তারা স্রষ্টা রূপে তো বটেই, সৃষ্টির উপকরণ রূপেও সাহিত্যে স্থান পেল না, এমনকি উনিশ শতকীয় রেনেসাঁস সত্ত্বেও। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পথের পাচালী'-তে দারিদ্রের ছায়া তুলে ধরতে গিয়ে আমরা সেই একই চিত্র দেখতে পাই। ঔপন্যাসিক তথা শিল্পী বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় উত্তর চব্বিশপরগণা জেলার নিশ্চিন্দিপুর গ্রামের দরিদ্রদের মধ্যে প্রান্তিক থেকে প্রান্তিকতর সমাজের যে বৃহত্তর দলিত জনগোষ্ঠীর মানুষ তাঁদের কথা চিন্তনে বিন্দুমাত্র ঠাঁই না দিয়ে ব্রাহ্মণ পরিবার থেকে অপু-দুর্গার ছবি এঁকেছেন। বাংলা কথাসাহিত্যে এমন অজস্র উদাহরণ আছে। যেমন আমরা সবাই জানি যে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের লেখা 'কপাল কুন্ডলা' উপন্যাসের কাহিনীর প্রেক্ষাপট পূর্ব মেদিনীপুর জেলার সমুদ্রতীরবর্তী সপ্তগ্রাম, নিম্নবর্গ অধ্যুষিত একটি অঞ্চল হওয়া সত্ত্বেও সেই নিম্নবর্গ থেকে কেউই কপালকুন্ডলা কিংবা নবকুমার হতে পারলেন না। সেই নবকুমার এবং কপাল কুন্ডলাও প্রকৃত পক্ষে ব্রাহ্মণ পরিবারের সদস্য।

নিম্নবর্ণের মানুষেরা সমাজের প্রান্তে বাস করেও সমাজকে নানা ধরণের পরিসেবা দিয়ে থাকেন এটা সত্য। কিন্তু এঁদের সম্পর্কে আমাদের চেনাজানার পরিধিটা কেবল সকীর্ণই নয়, বলা চলে তা একটা বাঁধাছকে আবদ্ধ। কেননা খুব বেশি দিনের ঘটনা নয় অল্পকয়েক বছর আগে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের মতো লেখক 'দেশ' পত্রিকায় (শারদীয় সংখ্যা, ২০০৫) লিখে দিতে পারলেন- "আম্বেদকর ছিলেন ভাঙ্গি বা

মেথরসম্প্রদায়ের সন্তান"[1]।[৫] আম্বেদকর যে কতটা নিচু স্তর থেকে উঠে এসেছেন, তা বোঝানোর জন্যই যেন সবার প্রথমে মনে এসে গেল ভাঙ্গি-নামটি। হাড়ি-বাগদি-ভাঙ্গি-কাওরা-মুচি-মেথর– এই শব্দগুলি তো আসলে এক-একটা জাতের নাম নয় ; এর ভেতরে ধরা আছে হীনতার স্তর অনুসারে দলিতের স্থানাঙ্কচিহ্ন।

হিবটগেনস্টাইন বলেছিলেন- "ভাষার ভেতর দিয়ে যা প্রতিফলিত হয়, আমরা তাকে ভাষায় প্রকাশ করতে পারি না"।[৬] এই নামগুলোই দলিতদের কুলচিহ্ন ধারণ করে রেখেছে অঙ্গে। এঁদের মধ্যে তাই যেকোন একটি নাম উচ্চারণ করার পর তার আর কোনও ব্যাখ্যানের প্রয়োজন হয় না। এক্ষেত্রে আমরা যদি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের লেখা 'দেবী চৌধুরাণী' উপন্যাসটির কথাই মনে করি তাহলে দেখা যায়, জমিদারবাড়ির গৃহবধূ প্রফুল্লর নামে কলঙ্ক রটাতে হবে। অতএব সর্বস্থানে প্রচার করে দেওয়া হলো সে বাগদির মেয়ে। 'বাগদি'- শব্দটির ভেতরেই এমন একধরণের হীনতার চিহ্ন লেগে আছে যে, গৃহবধূকে পরিত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নিতে জমিদারবাবুকে আর বেশি কিছু ভাবতে হল না। কেননা সে যে দলিত, সে যে সমাজের চোখে হীন তাই 'বাগদি' পরিচয়টুকুই যথেষ্ঠ।

বাংলা সাহিত্যের বহু ঔপন্যাসিকের সাহিত্য কর্ম মহৎ হয়ে উঠেছে নিম্নবর্গের মানুষের উপস্থিতিতে। শিল্পীর সপ্রতিভ স্পর্শ পেয়ে সাহিত্যের আঙিনায় বহু চরিত্র লাভ করেছেন অমরত্ব। আধুনিক সমাজের মধ্যে শিক্ষায় ও সংস্কৃতিতে, মেধায় ও বুদ্ধিতে যে সব দলিত তথা নিম্নবর্গের মানুষ উপর মহলে পা রাখার যোগ্যতা অর্জন করেছেন, তাঁদেরকেও প্রতিনিয়ত যন্ত্রণায় এফোঁড় ওফোঁড় বিদ্ধ হতে হয়; এমন সব বাস্তব চরিত্রের সাক্ষাৎ মেলেনি আজ পর্যন্ত কোনও উপন্যাসে। আধুনিক সময়ের যূপকাষ্ঠে দলিতদের বলি হওয়ার কাহিনি এমন কিছু নতুন ঘটনা নয়। বহু লেখাপড়া শেখা শিক্ষিত মানুষগুলিও যে নীচু জাতে জন্মানোর অপরাধে সহকর্মীদের কাছ থেকে আঘাতে আঘাতে জর্জরিত হয়ে থাকেন, এরকম অজস্র উদাহরণ সর্বত্রই ছড়িয়ে আছে।

জাতিভেদ বর্ণভেদের ফলে একদল মানুষের অবস্থান একেবারে সমাজের তলানিতে এসে ঠেকেছে। কী শিক্ষার ক্ষেত্রে, কী সংস্কৃতির ক্ষেত্রে, কী সাহিত্যের ক্ষেত্রে কিংবা শিল্পের ক্ষেত্রে তাঁদের অস্তিত্ব নেই বললেই চলে। অথচ তাঁরা ভারতের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর মানুষ। আর এই তলানীর সমাজ

থেকে যখন কেউ উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে উঠছেন তাঁরা তাঁদের করুণতম অবস্থানকে সনাক্ত করে ব্যথিত হচ্ছেন। আপন অস্তিত্বকে প্রতিনিয়ত খুঁজে ফিরছেন। তাঁরা যত বেশি বেশি করে নিজের অতীতকে উৎখনন করছেন ততই তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি প্রসারিত হচ্ছে নানাদিকে। জাতিব্যবস্থা ও ধর্মের আমানবিক নিগড়কে ভাঙার স্বপ্নে তাঁরা জাগছেন। নিজেদের তাঁরা সাম্যের অধিকারে প্রতিষ্ঠা করতে চান। বিষয়টিকে আরও স্পষ্ট করে বোঝাতে বাংলাভাষা ছাড়াও অন্যান্য ভারতীয় ভাষার কয়েকটি কাব্যের প্রসঙ্গ তুলে ধরা যেতে পারে। গুজরাতি কবি নীরব প্যাটেল লিখলেন তাঁর 'আক্রোশ' নামক কাব্যগ্রন্থ। কাব্যের মূল বিষয় হল উচ্চবর্গীয় মানুষের অত্যাচার। আর সেই অত্যাচারের বিরুদ্ধে ক্রুদ্ধ কবি তেজী ভাষায় কাব্য রচনা করেন। একই ধারা লক্ষ্য করা যায় উত্তরপ্রদেশের কবি আদম গোণ্ডাবীর মধ্যে। উত্তরপ্রদেশের গোণ্ডা জেলার প্রান্তিক অঞ্চলের বাসিন্দা এই কবি রচনা করেন 'চামারের গলি' নামক কাব্যগ্রন্থ। সেখানে দেখা যায় ঠাকুরদের অত্যাচারে চামারের গলি কাঁদে। তবে কান্নার মধ্যে শেষ হয়ে যাওয়া কাব্যের বিষয়বস্তু নয়- প্রতিরোধ রচনা করাই হল এর মূল সাধনা।

সিদ্ধালিঙ্গাইয়া কন্নড় ভাষার কবি। 'কালো জঙ্গলের গান'- তাঁর বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ। এই কাব্যের কবিতা কবি নিজের অস্তিত্বকে খুঁজতে গিয়ে উচ্চবর্গের প্রতি যে ক্ষোভের প্রকাশ করেছেন তা তার কাব্য থেকে কয়েকটি ছত্র থেকে বোঝা যায়।

"ওরা বলে বেড়ায় সব মানুষই এক, একই ঈশ্বরের সন্তান,
অথচ দলিত দেখলেই তড়াক লম্ফ খায়।
ভাবখানা এমন যেন নাগের শরীরে পড়েছে চরণ।
ওরা পথ রুখে দাঁড়ায় পান্থশালার,
পানীয় জলের কুয়োর কিংবা অন্য কিছুর
ওরা কুকুরকে ঢুকতে দেয় নিজস্ব রন্ধনশালায়,
দলিতকে নয়- যদিও দলিতের বিষ্ঠা ওই কুকুরেই খায়।
ওরা আয়োজন করে দলিতের মঙ্গলের,
দলিতের নাম করেই নিজের গলায় মালাটা চড়ায়।[৭]

এই প্রকারের সাহিত্য নিয়ে আলোচকদের মধ্যে অনেক বিতর্ক হয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন হাজার হাজার বছরের অত্যাচার কি মানুষ ভুলতে পারেন কখনো ? সমাজে যুগ যুগ ধরে যারা অপমানিত হয়েছেন, পেয়েছেন শুধু লাঞ্ছনা- বঞ্চনা- অসম্মান। আসলে এ-সব তারই বহিঃপ্রকাশ। অবমাননার ক্ষেতে ক্ষেতে আজ্জানো ফসল। বলা চলে এই ফসল এক প্রকারের সোনার ফসল।

সমাজ ব্যবস্থার নিষ্ঠুর নিয়মে নিম্নকুঠুরির মানুষের মনে নানা কারণে হতাশা জেগে ওঠে। নিম্নকুঠুরির মানুষ বাস করেন এক প্রকার চাপের মধ্যে তা হল উপরের চাপ। সেই চাপ উৎখাত করে উপরে ওঠা খুবই কঠিন। আর সেই কঠিন বাস্তবতাকে মানুষের সামনে তুলে ধরার জন্য দলিত লেখকরা বেছে নিলেন ছোটগল্পের আঙ্গিককে। সেখানে তাঁরা উপস্থাপন করলেন সমাজের সেই তলানির চিত্রকে। এবার আলোচনা করা হবে সেই ছোটগল্পের প্রেক্ষিতে দলিত নন্দনতত্ত্ব ঠিক কীরকম।

সম্প্রতি 'চতুর্থ দুনিয়ার গল্প' শিরোনামে বাংলা দলিত সাহিত্য সংস্থার পক্ষ থেকে একটি গল্প সংকলন প্রকাশিত হয়। আর এই গল্প সংকলনে স্থান পান বিভিন্ন দলিত গল্পকারের নানান আঙ্গিকের ছোটগল্প। দলিত সাহিত্যের নান্দনিকতা বোঝাতে উক্ত সংকলন থেকে প্রথমেই যে গল্পটির কথা বলা উচিত তা হল গোবিন্দদাস শৌণ্ডের একটি গল্প। গল্পটির নাম হল 'জলে ডাঙ্গায়'। গল্প হিসেবে এটি একটি চমৎকার গল্প। এই গল্পের যে বিষয় তা থেকে বোঝা যায় জীবনের অভিজ্ঞতার কাছে সরাসরি হাত পেতেছেন গোবিন্দদাস শৌণ্ড। জেলে-জীবনের বঞ্চনার ইতিহাস সেই অভিজ্ঞতার আলোকে তাঁর গল্পে দ্যুতিময় হয়ে উঠেছে। গল্পকারের কথায়- শশী ভাসানি ভেটির মাঝি। একটি হাত কুড়ি লম্বা পাটিয়া নৌকা, ছ-সাত জন মানুষ আর জাল নিয়ে সে চলে যায় অকুল সমুদ্রে। সমুদ্রের গতি প্রকৃতি তার নখ দর্পণে। রেডিও লাগে না। আবহাওয়া দপ্তর কি বলে না বলে সে তোয়াক্কা করে না। সমুদ্রের গর্জন, গুমোট আবহাওয়া, রোদের তেজ, মোহনার ডাক ইত্যাদি থেকে শশী আন্দাজ করে নেয় ; সামনে আবহাওয়া কেমন যাবে। দিক নির্ণয় যন্ত্র নেই। গভীর অন্ধকারে রাতে পরিষ্কার আকাশের নক্ষত্র দেখে বলে দেয় কোনটা কোন দিক।

এখানে লক্ষ করার বিষয় একজন নিরক্ষর মানুষ, যে কোনদিন লেখাপড়ার সুযোগ পায়নি। যার গায়ে জামা থাকে না, একখানি আট-হাতি ধুতি পরা কিংবা কোমরে গামছা জড়ানো যে-মানুষ দিন নেই রাত নেই সমুদ্রের ঝড় তুফানের সঙ্গে লড়াই করে জীবন-জীবিকার সন্ধান করছেন, সেই মানুষ জন্মের

অধিকারে একজন জ্যোতির্বিজ্ঞানী। সেই মানুষ জীবন ও জীবিকার তাগিদের ভিতর দিয়ে আবহাওয়াবিদ। এমন হতভাগ্য দেশে এঁদের জন্ম হয় যে সেই দেশ কখনো এঁদের এই মেধাকে কাজে লাগাতে পারে না। আমরা এও লক্ষ করি, গভীর অন্ধকার রাতেও আকাশের নক্ষত্রের অবস্থান দেখা সম্ভব হলে, সেই রাতের দিক নির্ণয়ের অভিজ্ঞান শশীর অজানা নয়। এই শশী কেবল নিরক্ষর সমাজের একজন শশী নন, বিকাশবিহীনভাবে হারিয়ে যাওয়া হাজার হাজার শশীর প্রতিনিধি। গল্পকারের কথায়- শশীর সারা জীবনের সঞ্চয়, তার কেউ দাম দেয় না। তার দাম শুধু শশীর নিজের কাছে আর ঐ শিষ্য সঙ্গী ছ'জন তাগড়াই জোয়ান আর তাদের ছোট ছোট নিরন্ন সংসারগুলির কাছে। দুনিয়ার আর কেউ বোঝে না। প্রাণপাত পরিশ্রম করে সাগর সেঁচা মুক্তোর মত ঝকঝকে মাছ ডাঙায় তুলে বেচতে হয় –গরজে। এটাই শশীর দুঃখ।

আমরা জানি একদিকে যেমন মেধাহীন মেধাবান হন অন্যদিকে তেমনি মেধাবান মেধাহীন হন। ভারতবর্ষের নৃ-বৃত্তের ঘূর্ণায়মান এই ছবি-ই হল দলিত জীবনের সুক্ষ্ম নান্দনিকতা। গোবিন্দদাস শৌণ্ডের আলোচ্য গল্পটিতে সেই নান্দনিকতা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সমাজের অস্পৃশ্যরা অর্থাৎ দলিতরা তাদের যথাসর্বস্ব দিয়ে কায়িক শ্রমকে মূলধন করে বাঁচার লড়াই করেন। বুক চিতিয়ে তারা প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই করেন। এঁদের ঘরের জোয়ান সোমত্ত ছেলে সমুদ্রের ঘূর্ণি তুফানে চোখের সামনে ভেসে যায়। প্রকৃতির সঙ্গে নিষ্ঠুর যুদ্ধের ফলাফল হাসি মুখে মেনে নিতে হয় তাঁদের। এই হল দলিত জনগোষ্ঠীর আভ্যন্তরীণ নন্দনতত্ত্ব। বিরহ হল যার মূল সুর। এই নিগূঢ় নান্দনিকতার বাইরে আর একটি নন্দনতত্ত্বের হদিশ মেলে উক্ত গল্প থেকে। অসৎ ব্যবসায় ঈশ্বরকে সামনে রেখে শ্রীবৃদ্ধির দরজা খোলে। মিথ্যা আর জোচ্চুরির সাথে ঈশ্বর প্রেমের মাখামাখি সম্পর্ক। আমরা জানি শোষকের ঈশ্বর শক্তিমান আর শোষিতের ঈশ্বর নির্বাক দর্শক। কাঞ্চন বৃত্তের মধ্যে ঈশ্বর হল উজ্জ্বল অন্যদিকে নিরন্নবৃত্তের মধ্যে ঈশ্বর নিষ্প্রভ। গল্পকারের কথায়, 'বছর ঘুরে বছর এসেছে। আবার এসেছেন নগেনবাবু। নগেনবাবুকে এখন চেনাই যায় না। হাতে গেঞ্জির প্যাকেটের মত সিগারেটের প্যাকেট। থু থু লেগে সিগারেট ভেজার উপায় নেই, দেড় ইঞ্চি মত ফিলটার। ধোঁয়া সাফ হয়ে আসে। এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে নগেনবাবু বললেন-

'চেইন' কথাটা আপনার নিশ্চিত জানা। বলতি পারো শেকল। একটি কড়া ধরি টান দিলি আর একটা আসে। এবার আর বরফ কম পরার ভয় নাই। আকাশের দিকে জলের ফোয়ারা ছুঁটিয়ে গিট গিট আওয়াজে চলছে তার নিজের বরফের কল। নিজের একটা লরির জায়গায় সার দিয়ে দাঁড়িয়ে তিন তিনটে লরি। সমুদ্রে অনেকগুলি ফিশিং লঞ্চ। কোল্ড স্টোরেজ করারও একটা ইচ্ছা ছিল নগেনবাবুর। ব্যাঙ্ক সায় দেয়নি তাই বহু কষ্টে দমন করেছেন সে ইচ্ছা। ভগবান যদি দিন দেন"।[৮]

নগেন শর্মাদের যে ভগবান একদিন ভালো দিন দেবেন এমন স্পষ্ট ইঙ্গিত আছে এখানে। আজ যার কোল্ড স্টোরেজ নেই, কাল তাঁর কোল্ড স্টোরেজ হয়ে যাবে। এ হল ভগবানের দান। এই এক বৃত্ত যার নাম নিরন্নবৃত্ত আর শশী সেই নিরন্নবৃত্তের মানুষ। তিনি জানেন মিথ্যাকে আশ্রয় করে ভগবানের দোহাই পাড়া ভন্ডামি। তাঁর ভগবান হল সত্য সুন্দর। ভন্ডামি নেই। তাই তাঁর মুখ থেকে বেরোয়, 'ভগবান কি তোমার একার'? এখানে স্পষ্ট ঈঙ্গিত পাওয়া যায় গরিবের কোন ভগবান নেই। ভগবান হলেন বড়লোকের। দুর্বৃত্তায়ণকে ঈশ্বরায়ণের মধ্যে আনয়ন করাই ভারতের যে শেষের এক নতুন সংস্কৃতি। গল্পকার গোবিন্দদাস এই সংস্কৃতিকে তাঁর 'জলে ডাঙ্গায়' গল্পের মধ্যে সূক্ষ্ম দড়ি দিয়ে বেঁধে দিয়েছেন।

এই গল্পকারের আর একটি গল্পের সংকলনের নাম 'অনাদৃতা'। সংকলনটির প্রকাশকাল ১৯৭৭-এর ২৫ শে বৈশাখ। এই সংকলনের একটি গল্প হল 'মিছিলের পাশে মিছিল'। এই গল্পের মূল চরিত্র আদিত্যকে খুঁজে পাওয়া যায় এক নতুন নান্দনিকতায়। লেখাপড়া জানা যোগ্যতা সম্পন্ন ছেলে হল আদিত্য। তার চাকরির একান্ত প্রয়োজন। প্রয়োজনের এই চাকরিটি সোজা পথে হয় না দেখেই ঘুষের জোরে তার চেয়েও অনেক যোগ্য প্রার্থী ও অনেক অভাবী ছেলেকে টপকে চাকরি হয়ে যায় আদিত্যের। গল্পকারের কথায় চাকরির জন্য আদিত্যকে খোয়াতে হয়েছে অনেক কিছু। তার মধ্যে সবচেয়ে মুল্যবান যেটা খোয়াতে হয়েছে তা তার আদর্শ। জনগণের নেতার তাঁবেদারি করে উপযুক্ত দক্ষিণা দিয়ে যখন চাকরির নিয়োগপত্রটা নিয়ে বাড়ি ফিরে আসছিল, তখন যেন একবার তার দেহমন বিক্ষুব্ধ হয়ে নিজেকে নিজে দলিত মথিত করে চিৎকার করে বলে উঠতে চাইছিল 'অন্যায় অন্যায়'।

বাবুসমাজের উৎকোচ সংস্কৃতি হল এই গল্পের মূল বিষয়। এই সংস্কৃতিতে তিনদিনের কাজ একদিনে শেষ হয়। গরহিত কাজ হিতের মোহর প্রাপ্ত হয়। এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার সাহস পায় না আদিত্য। গল্পের বড়বাবুর কথায় –

"এই রকমই চলছে, যে আসে তাকে এই রকমই করতে হয়, বেশি ঝামেলা হুজ্জোত করে লাভ নেই। চব্বিশ ঘণ্টার নোটিশে সমুদ্রের ধার থেকে একেবারে পর্বতের উপরে বদলি হয়ে যাওয়া অসম্ভব নয়"।[৯]

উক্ত সংস্কৃতির ধারা এমনি যে এই ধারার এমন কিছু অসাধু মানুষ আছেন যারা বাঁহাত এবং ডানহাত দু-হাতেই পেতে চান। বা হাতের পাওনা গোপনে সারেন আর ডান হাতের পাওনার জন্য মিছিল করেন রাজপথে। শার্ট, বুট, টাই পড়া বাবুরা 'দিতে হবে' 'দিতে হবে' শ্লোগান দিয়ে আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে তোলেন। এই শ্লোগানে কর্তৃপক্ষ কেঁপে ওঠেন এবং তাদের ডান হাতের পাওনাও মিলে যায়। এই মিছিল আসলে বাবুদের মিছিল। গল্পকার দেখতে পান- তার পাশাপাশি দরিদ্র বেকার অর্ধ উলঙ্গ জনতার আর একটা মিছিল সামনের দিকে শূন্য পাত্র মেলে ধরে ঠায় দাঁড়িয়ে আছে।

একটা মিছিলের পাশে আর একটা মিছিল যায়। গল্পকার গোবিন্দদাস দ্বিতীয় মিছিলের পক্ষ নেন। শার্ট-প্যান্ট-টাই পরা বাবুদের মিছিলে নিজেকে হাজির করতে কুণ্ঠিত হন তিনি। দরিদ্র, বেকার, অর্ধউলঙ্গ, কঙ্কালসার জনতার মিছিল যদি কোনদিন হয় এবং 'দিতে হবে', 'দিতে হবে' বলে তাঁরা যদি কখনও আওয়াজ তোলেন তাহলে মানবতাবাদী গল্পকার গোবিন্দদাস সেই মিছিলেই পা মেলাবেন। এবং তাঁদের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে আওয়াজ তুলবেন। এরকমই একটা ইঙ্গিত মেলে ধরা আছে গল্পের শেষে আদিত্য নামক চরিত্রটির মধ্যে। অতএব স্পষ্ট দেখা যায় এই গল্পের কেন্দ্রে যে মূল বিষয়টি বিদ্যমান তা হল স্রোতের বিরুদ্ধে স্রোতের সৃষ্টি।

এছাড়াও বর্তমান সময়ে বেশ কিছু ছোটগল্প লেখা হচ্ছে। বই আকারেও আছে কিছু কিছু ছোটগল্প প্রকাশিত হচ্ছে। কপিলকৃষ্ণ ঠাকুরের 'মধুমতি অনেক দূর', গোবিন্দ শৌণ্ডের 'অনাদৃতা', মনোহর বিশ্বাসের 'কৃষ্ণ মৃত্তিকার মানুষ', সুনীল কুমার দাসের 'দলিত মানুষের গল্প', নকুল মল্লিকের 'মহাসিন্ধু', বিমলেন্দু হালদারের 'আকাশ মাটি মন' প্রভৃতি গ্রন্থের সব গল্পই দলিত নান্দনিকতাপূর্ণ তা নয়। কিন্তু একথা ঠিক যে গল্পগুলি হল এমপ্যাথি ভিত্তিক। কেননা এমপ্যাথি বলার কারণ হল গল্পের বিষয় আসলে লেখকেরই বাস্তব জীবনের চিত্র। তা বাইরে থেকে দেখে সৃষ্ট নয়।

দলিত লেখকদের লেখা সাহিত্য, অ-দলিত লেখকদের সৃষ্ট সাহিত্য থেকে পৃথক কোথায়?

'দলিত জীবনই দলিত লেখকদের একান্ত নিজস্ব। সভ্যসমাজের কোনো লেখককে তো এই দলিতের জীবন কাটাতে হয়নি'।[১০] দলিত মানুষদের জীবন নিয়ে ১৯৭০ এর আগে কোনো লেখক লেখেননি বা লিখে যাননি এমনটা বলা অনুচিত। অ-দলিত লেখকরাই প্রথম দলিতদের নিয়ে লিখতে শুরু করেন। তাঁদের কলমেই প্রথম উঠে এলো ব্রাত্য জনের কাহিনি। বাংলা কথাসাহিত্যের সূচনালগ্ন থেকে গল্পকার তথা ঔপন্যাসিকদের উদ্দেশ্য এবং তাঁদের সাহিত্যের পরিণতির পরিপ্রেক্ষিতে যদি আলোচ্য বিষয়টিকে বিচার করে দেখি, তাহলে দেখা যায় যে প্যাঁরীচাদ মিত্র থেকে শুরু করে বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখের গল্পে ও উপন্যাসের আখ্যানবিশ্বে 'নিম্নবর্গ' তথা দলিত শ্রেণি শুধুমাত্র কাহিনির প্রয়োজন সাধনে অবস্থান করেছে। তাদেরকে বিচ্ছিন্ন, দুর্বল ও সামঞ্জস্য বিধানের উপকরণ ছাড়া আর কোনো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় দেখা যায় না। তাঁরা কল্পনা ও সৃজনশীলতার অসীম ক্ষমতাবলে নিম্নবর্গের মানুষজনকে কাহিনির আখ্যানবিশ্বে পরিবেশন করেছেন মাত্র। তবে আরও পরবর্তী পর্যায়ে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ লেখকের লেখায় নিম্নবর্গ তথা দলিত শ্রেণীর মানুষজন ঠাঁই পেয়েছে লেখকের সংবেদনা ও হৃদয়াবেগের স্ফূর্ততায়। ধর্মীয় বিবেচনায় নিচুজাত, অর্থনীতির মানদণ্ডে লাঞ্ছিত-বঞ্চিত ও দুর্বল মানুষেরা উপন্যাসের ঘর বাড়িতে স্থান পেতে শুরু করল। অল্প কিছু সময়ের মধ্যে লেখকের হৃদয়ধর্ম, বুদ্ধিবৃত্তি, চিন্তা ও কল্পনার গভীরতায় উঠে এলো নিম্নবর্গের জীর্ণ বাসস্থান ও অশান্ত অন্তর্লোক। ফলে নিম্নবৃত্তের মানুষের গভীর-বিস্তৃত সংস্কৃতিক যে বিশ্ব তা ক্রমে ক্রমে উদ্ভাসিত হল। যা বাংলা উপন্যাসের জগৎকে করে তুলল বিস্তৃত ও সমগ্রতার সন্ধানী।

সতীনাথ ভাদুড়ি, কমলকুমার মজুমদার, গুণময় মান্না, দেবেশ রায়, সাধন চট্টোপাধ্যায় এবং মহাশ্বেতা দেবী তাদের গভীর সত্যানুসন্ধ্যানী দৃষ্টি ফেললেন শতাব্দি ব্যাপী সমাজে অবহেলিত, লাঞ্ছিত, বঞ্চিত, মূক, অখ্যাত, হীন, অপাংক্তেয় মানুষদের প্রতি।

প্রাক্-স্বাধীনতা ও স্বাধীনতা উত্তরকালের সাক্ষী, বিচিত্র বর্ণময় জীবনের রূপকার তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবন ও মানসমুক্তি ঘটেছে ভারতবাসীর শৃঙ্খল-মোচনের জটিল ইতিহাসের ঘূর্ণাবর্তে। এক কঠিন আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক পটভূমিতে নানা ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে লেখক বা স্রষ্টা থেকে বাংলা ও বাঙালির জীবন ইতিহাসের স্রষ্টা ও লেখক হিসাবে জন্মান্তর ঘটেছিল তাঁর। 'সমকালে দাঁড়িয়ে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় বিষয়কর্ম ও সমাজসেবার মধ্যে দিয়ে একদিকে যেমন দেখেছেন মহাজন ও জমিদার শ্রেণিকে তেমনি অন্যদিকে লক্ষ করেছেন সমাজের নীচু স্তরের মানুষজন- চাষি, প্রজা, কৃষাণ, অস্পৃশ্যদের। কর্মে ও কথায় তাদের জীবনের শরিক ও জ্ঞাতি হয়ে বসবাস করেছেন'।[১১]

ইংরেজ বণিকের রক্তচক্ষু, শোষণ-পীড়ন, দেশীয় জমিদার, মহাজন শ্রেণির প্রবঞ্চনা-প্রতারণা, নির্মম শোষণ প্রক্রিয়া নিম্নবিত্ত সমাজের মানুষের জীবনকে অসহনীয় করে তুলেছিল। নিজভূমে পরবাসী এই সমস্ত জনগোষ্ঠীর কথাও পাওয়া গিয়েছে তারাশঙ্করের উপন্যাসে। ফলে সমকালীন পটভূমিতে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় 'ধাত্রীদেবতা' (১৯৩৯), 'গণদেবতা', (১৯৪২), 'পঞ্চগ্রাম', (১৯৪৩) প্রভৃতি গণজীবন ও গণচেতনা নির্ভর উপন্যাস লিখলেও নিম্নবর্গের তথা অপাংক্তেয় জনগোষ্ঠীর অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম কোথাও স্পষ্ট নয়। এইসব অস্পৃশ্য মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম
বা প্রতিবাদী চেতনার অনেকটা স্পষ্টভাবে প্রকাশ ঘটেছে 'কালিন্দী' (১৯৪০), 'কবি' (১৯৪৪), 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' (১৯৪৭), 'জঙ্গলগড়' (১৯৬৪), 'অরণ্যবহ্নি' (১৯৬৬) প্রভৃতি উপন্যাসে। তারাশঙ্করের উপলব্ধিতে ধরা পড়েছে সমকালীন সমাজের বিকৃত রূপ, মানবের আদিম প্রবৃত্তি, সমাজ দেহের গভীরতম ক্ষত, নিম্নবর্গীয় উপজাতি গোষ্ঠীর সমাজ ও তাদের ভঙ্গুর জীবনে অবহেলা-ঘৃণা, সামাজিক-সংকট-দ্বন্দ্ব-বিরোধ, তাদের সংগ্রাম ও শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ বা লড়াই ইত্যাদি। এবার আসা যাক মূল আলোচনায়। তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায়ের এইসব লেখায় নিম্নবর্গের মানুষের কথা উঠে এলেও মূলত তা ছিল তার বাইরে থেকে দেখা। কেননা তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখক সত্তায় বর্গমোচনের ইচ্ছা সর্বদা

জাগরুক ছিল। তাঁর লেখা 'সন্দীপন পাঠশালা' (১৯৪৬) উপন্যাসে নিজের মনের এই বাসনাকে সীতারামের বর্গমোচনের আলোকবর্তিতা জ্বালানোর মধ্য দিয়ে প্রকাশ করেছেন। সমাজের উঁচুজাতের মানুষের কাছে কীভাবে নীচুজাতের মানুষ লাঞ্ছিত হয়েছে আসলে তারই এক বাস্তব প্রকাশ ঘটেছে উক্ত লেখায়। শ্রেণিবিভক্ত সমাজ ব্যবস্থায় জাতিগত বৈষম্যের যে চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে, তা ব্যক্তি তারাশঙ্কর কখনই মানতে পারেননি। সমাজচেতনার সেই তীব্র ক্ষোভ থেকেই তিনি লেখার মূল উপাদান হিসাবে বেছে নেন সমাজের সেই জীর্ণ, অসহায় মানুষজনকে। তাই যখন লেখককে প্রশ্ন করা হয় তাঁর লেখার মূল উৎস সম্পর্কে তখন তিনি নিজেই অকপটে বলেছেন-

> "আমার বই বলুন আর যা-ই বলুন, সেটা হচ্ছে আমার এই রাঢ় দেশ। এর ভেতর থেকেই আমার যা-কিছু সঞ্চয়"।[১২]

কিন্তু অন্যদিকে সেই সমাজেরই অধিবাসী হয়ে একজন দলিত তথা নিম্নবর্গের লেখক যখন নিজের জীবনকে কেন্দ্র করে নিজের জবানীতে নিম্নবর্গ তথা অপাংক্তেয় সমাজের ইতিহাস তুলে ধরেন তখন তাকে লিখতে হয় –

> "আমার জবাব ওসব কিছুই নয়, আমি জীবন লিখেছি। শুধুমাত্র একটা জীবন। তার এগিয়ে চলা। পিছিয়ে পড়া। হেরে যাওয়া, হারিয়ে দেওয়া, হারিয়ে যাওয়া। হারিয়ে গিয়ে খুঁজে পাওয়া। আঘাতে ঠোক্করে ক্ষত-বিক্ষত রক্তাক্ত হওয়া। আছাড় খেয়ে মাটিতে পতিত হয়ে আবার সেই মাটিকে অবলম্বন করে উঠে দাঁড়াবার প্রয়াস। আকাশকে ছুঁয়ে দেবার দুর্বার অভীপ্সা ইত্যাদি"-।[১৩]

তাই একথা বলা খুব একটা অযৌক্তিক হবে না যে, দলিত লেখকের প্রতিটি কথা কাহিনিতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে আসলে সেই লেখকের-ই গোটা জীবন। এমন ভাবনার আধারকেই আশ্রয় করে লক্ষিত হয় তাঁদের জীবনকেন্দ্রিক এক নতুন ধারার সাহিত্য। সারা ভারত জুড়েই এই সাহিত্যের অন্তরাত্মায় একটাই সুর অনুরণিত হতে দেখা যায়।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন বীরভূম জেলার জমিদার পরিবারের সন্তান। কিন্তু তবুও তাঁর লেখায় বর্ণ-বৈষম্য-বিরোধী চেতনার প্রকাশ ও প্রতিবাদ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। যেমন তাঁর 'কবি' (১৯৪৪) উপন্যাসে। আন্তোনিও গ্রামশি (১৮৯১-১৯৩৭) কোন একসময় 'কবি' উপন্যাসের নিতাইকে নিয়ে আলোচনা করেছেন। তাঁর ভাষা অনুসারে 'কবি' উপন্যাসের নিতাইকে ডোম বংশ তথা ব্রাত্যসমাজের বা

সাব-অল্টার্ন কবি বললেও পুরোটা বলা হয় না। কারণ, যে বংশের ক্ষেত্রে সজ্জন হওয়াটাই ঘোর অনিয়ম সেখানে নিতাই-এর কবি হয়ে ওঠা একটা বড়োসড়ো দুর্ঘটনা। নিতাই কবিয়াল হল রীতিমতো 'খুনীর দৌহিত্র, ডাকাতের ভাগিনেয়, ঠ্যাঙাড়ের পৌত্র, সিঁদেল চোরের পুত্র'। "রাঢ় বাংলার নিম্নবর্ণের নিম্নবর্গের কবিয়ালটি যেন অভিশপ্ত সিসিফাসেরই সন্তান এবং অভিশপ্ত প্রমিথিউস"।[১৪]

'কবি' উপন্যাসের আখ্যানবিশ্ব পড়তে গিয়ে দেখা যায়, ডোমবংশজাত নিতাই-এর কবি হয়ে ওঠার পথ জাতপাতের কাঁটা বিছানো ছিল। আসলে সেই সময় নিতাই কবিয়ালের কবি হয়ে ওঠা যতটা কঠিন ছিল, তার চেয়ে কঠিন ছিল উচ্চবর্ণের উচ্চবর্গের মানুষদের পক্ষে নিতাইকে কবি হিসেবে মেনে নেওয়াটা। কিন্তু বর্ণবৈষম্য-বিরোধ উচ্চবর্ণের লেখক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় 'কবি' উপন্যাসে বীরভূমের এক অন্ত্যজ ভূমিপুত্রের আত্ম-আবিষ্কার তথা আত্মপ্রতিষ্ঠার কাহিনী নির্মাণ করলেন। পুর্বনির্ধারিত শিল্পীর অনুপস্থিতিতে গ্রামের চন্ডীমেলার আসরে নেমেই নিতাই তার দক্ষতার পরিচয় দিয়েছে এবং প্রশংসাসূচক হাততালির পাশাপাশি তাকে হজম করতে হয়েছে বিদ্রুপ আর ইতর রসিকতার বাণ। এমনকি প্রতিদ্বন্দ্বী মহাল কবিয়ালের নিন্দা ও অপমানও হজম করতে হয়েছে তাকে। যেমন-

'আঁস্তাকুড়ের এঁটোপাতা- স্বগগে যাবার আশা গো...
গরুড় হবেন মশা গো- স্বগগে যাবার আশা গো'।[১৫]

নিতাই কবিয়াল ছিলেন দলিত, প্রান্তিক এবং বর্ণকৌলিন্যে নিম্নবর্ণের বলেই তাকে এই ধরনের ব্যজস্তুতি শুনতে হয়। তাকে ইচ্ছাকৃতভাবে বারবার ব্যঙ্গ-বিদ্রুপে 'মহাকপি' বলে সম্বোধন করা আসলে বর্ণগত কৌলিন্যের দাপটকেই প্রকাশ করে। এমনকি এও লক্ষ্য করা যায় যে, নিতাইকে পুরস্কার বিতরণের সময় অনাবশ্যক জ্ঞানও দিয়েছে এভাবে-

"একটা মেডেল তোকে দেওয়া হবে... কিন্তু খরবদার, আপন জ্ঞাতিগুষ্টির মত চুরি ডাকাতি করবি না, তুই বেটা কবি- a poet"।[১৬]

আসলে একধরনের গভীর ঈর্ষার জ্বালায় প্রশংসার ছদ্মবেশে উঁচুজাতের মানুষেরা এরকম অসভ্য-অশালীন ভাষা খুঁজে নেয়। নীচু জাতে জন্মগ্রহণ করেও নিতাইয়ের আত্মপ্রতিষ্ঠা ও আত্মনির্মাণকে মেনে নিতে পারেনা উঁচুজাতের মানুষেরা। বাল্যকাল থেকে নিতাই-এর কঠোর নিপুণ প্রস্তুতি উচ্চবর্গের উন্মাসিক

অন্যমনস্কতার নজরে পড়েনি। নিজস্ব প্রতিভা ও একাগ্র সাধনার ফলে কীভাবে আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করা সম্ভব তারা সে ইতিহাস জানতেও চায়নি।

এবার আলোচনা করব ভদ্র-পল্লীর লেখকের কলমে অভদ্র-পল্লীর মানুষ ঠিক কিভাবে উঠে এসেছে? এ প্রসঙ্গে প্রথমেই বলব মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা। কবিতায় মেধা-মনন, বোধ ও বোধির একসঙ্গে সমীকরণ ঘটলেও উপন্যাস কিন্তু আগাগোড়াই বুদ্ধিনির্ভর সাহিত্য প্রকরণ। অথচ বাংলা উপন্যাসের বিবর্তনে কোনো কোনো ঔপন্যাসিক কেবল বুদ্ধিজাত ঔপন্যাসিক সত্তার বিকাশ ঘটিয়েছেন। তাঁরা হার্দিক ঔদার্য কিংবা বিশ্বাসজাত আবেগ নয়, যুক্তিনির্ভর বুদ্ধিকেই উপন্যাসের প্রধান সঞ্চালক মাধ্যম হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন। আর এঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯০৮-১৯৫৬)। মার্ক্সীয় চিন্তার মননে সাহিত্যিক রূপকে বাস্তবায়ন এবং নারী পুরুষের জৈবিক কর্মকান্ডগুলোকে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর সমকালে নির্মোহ মেধাবী ও যুক্তি নির্ভর বুদ্ধিজীবী লেখক হিসাবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছিলেন। লেখক হিসাবে তাঁর সমকালে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়া আর কেউই তেমন কৃতিত্ব প্রদর্শনকারী ছিলেন না। শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের লেখায় গ্রাম্যজীবন ও কয়লাখনির জীবনের ছবি অপরূপ। কিন্তু তা শুধু ছবি হয়েই রয়েছে। বস্তিজীবন এসেছে, কিন্তু বস্তিজীবনের বাস্তবতা আসেনি, বস্তির মানুষ ও পরিবেশকে আশ্রয় করে রূপ নিয়েছে মধ্যবিত্তের রোমান্টিক ভাবাবেগ। সেখানে যে জীবনের সংঘাত ফুটে উঠেছে লেখকের ব্যক্তিগত জীবনে সেই গ্রামীণ জীবনের কোনো বাস্তব সংঘাত আসেনি। বাংলা সাহিত্যে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্য সৃষ্টি কোন আকস্মিক ঘটনা নয়। তার প্রমাণ পাওয়া যাবে সমকালীন ভারতবর্ষের সামাজিক ও রাজনৈতিক ঘটনাবর্তের নানা তরঙ্গ-বিভঙ্গে, ঘাত প্রতিঘাতে। ১৯১৪ থেকে ১৯১৮ পর্যন্ত চলেছে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, তার পূর্বে ১৯০৫ থেকে চলেছে স্বদেশী আন্দোলন। ১৯১৭ সালের রুশ বিপ্লব সমগ্র পৃথিবীতে সংগ্রামের মন্ত্র উচ্চারণের সুযোগ এনে দিয়েছে। যুদ্ধ পরবর্তী সময়ের ভারতবর্ষে অর্থাৎ ১৯১৯-এ একদিকে মন্টেগু চেমসফোর্ড ও রাওলার্ড আইন পরিকল্পনা অন্যদিকে ১৯২০-তে খিলাফৎ আন্দোলন ও অসহযোগ আন্দোলন এবং ১৯২১-এ গান্ধিজীর ডাক উত্তাল করে তুলল ভারতের আকাশ-বাতাস। অর্থসঙ্কট, হতাশা অনিকেত জীবনাচারণ প্রভৃতি অভিঘাতে জীবনের মূল্যবোধ পালটাতে শুরু করল। রুশবিপ্লবের পাশাপাশি সিগমুন্ড ফ্রয়েড (১৮৫৬-১৯৩৯), কার্ল ইয়ুং (১৮৭৫-১৯৬১), আলফ্রেড অ্যাডলার (১৮৭০-১৯৩৭) প্রমুখের চিন্তাধারার প্রবাহ আছড়ে পড়ল ভারতীয়

লেখকদের মননে-সৃজনে। ফলে- "ভাবাবেগে অস্থিরতায় কম্পমান লেখকও বাস্তবধর্মী জীবনের প্রতি দিকপাত করলেন। ড্রয়িং রুম-কেন্দ্রিক বাংলা সাহিত্যেও মার্কস, এঙ্গেলস-এর আলোচনার কপাট খুলে গেল।[১৭]

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাস্তবের কারবারী লেখক হয়ে ওঠার ক্ষেত্রে পারিবারিক পরিমণ্ডল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। পারিবারিক দিক থেকে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বৈজ্ঞানিক পরিমণ্ডলে মানুষ। পিতা হরিহরের একপুত্র আবহাওয়া বিভাগের কর্তা, একজন চিকিৎসক এবং অপরজন বঙ্গসাহিত্যের নামজাদা লেখক গোষ্ঠীর অন্যতম। শিক্ষিত সমাজের পরিমন্ডলে ভদ্র জীবনের আবহাওয়ায় মানুষ হয়েও ভদ্র জীবনের ভণ্ডামিকে আজীবন বরদাস্ত করতে পারেননি বলেই কর্মে, কথায়, আত্মীয়তায় তিনি মাটির কাছাকাছি সর্বহারা মানুষদের শরিক হয়েছেন এবং তাঁদের হয়ে কলম ধরেছেন। উত্তরাধিকার সূত্রে ভদ্রজীবন প্রাপ্ত হলেও সেই ভদ্রজীবন তার ভালো লাগেনি। তিনি মনে করেন তাঁর জীবনের পরিপূর্ণ স্বরূপ ব্যক্ত হয়েছে অভদ্র লোকের মধ্যে।

> "ভদ্রজীবনকে ভালবাসি, ভদ্র আপনজনদেরই আপন হতে চাই, বন্ধুত্ব করি ভদ্র ঘরের ছেলেদের সঙ্গেই, এই জীবনের আশা-আকাঙ্খা স্বপ্নকে নিজস্ব করে রাখি, অথচ এই জীবনের সংকীর্ণতা, কৃত্রিমতা, প্রকাশ ও মুখোশপরা হীনতা, স্বার্থপরতা প্রভৃতি মনটাকে বিষিয়ে তুলেছে। . .মাঝে মাঝে পালিয়ে ছোটলোক চাষা-ভুষোদের মধ্যে গিয়ে যেন নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচি"।[১৮]

মানিক দলিত সমাজে জন্মাননি, দলিত সমাজের দুঃখ যন্ত্রনার মধ্যে বড়ও হননি, কিন্তু দলিত সমাজের দুঃখ যন্ত্রনা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছেন, অনেক কাছ থেকে সেই দলিত মানুষদের দেখেছেন। এখানে বলা যায় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কলম আসলে সহানুভূতির কলম, সমানুভূতির নয়। সহানুভূতির কলমে কৃপা আছে, ভালোবাসা আছে, আছে অনুকম্পা। তার মধ্যে সহানুভূতির আত্মযন্ত্রনা আছে কিন্তু সমানুভূতির আত্মযন্ত্রনা নেই। অন্যদিকে যখন একজন দলিত লেখক সেই অনুকম্পা প্রত্যাখ্যান করেন ও নিজেই নিজের হাতে কলম ধরে নিজের জীবনের গাথা বলতে প্রয়াসী হন, তখন তার মধ্যে সেই সহানুভূতি অবিদ্যমান থাকে। সমানুভুতি-ই সেখানে উপজীব্য। তাই রাঢ় বাঙলার এক বাউড়ী-ঘর থেকে উঠে আসা গল্পকার সুনীল কুমার দাসের গল্পে লক্ষ্ করি, গল্পকার রাহুকে দূরের মানুষ বলে কখনই ভাবতে পারেন না, রাহুকে 'রাহুকাকু' বলে জানান দেন। এখানে লেখক ও তাঁর গল্পের চরিত্র একধরনের

মাটির নির্মাণ। গল্প থেকে তা বুঝতে পারা যায়। একে বলা হয় এক প্রকারের আমিজ-সাহিত্য। আত্মবীক্ষণ-ই হল এর প্রধান নন্দনতত্ত্ব।

লেখক আর তাঁর চরিত্র যখন এক মাটির নির্মাণ হয় তখন তা সাহিত্যের ভূবনে এক ভিন্ন মাত্রা পায়। উদাহরণ হিসাবে উল্লেখ করা দরকার এইকালের দলিত সমাজের শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক অদ্বৈত মল্লবর্মণের জীবনের একটি ঘটনা। পাঁচের দশকের একেবারে গোড়ার কথা। লেখক অদ্বৈত মল্লবর্মণ নিজের লেখা 'তিতাস একটি নদীর নাম'-এর পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করেন। তিনি সেই পাণ্ডুলিপিটিকে 'পুঁথিঘর' থেকে প্রকাশ করতে চান। কেননা পুঁথিঘরের মালিক অধ্যাপক সুবোধ চৌধুরীর সাথে লেখকের সম্পর্ক ছিল অনেকখানি আপনজনের মতো। অধ্যাপক চৌধুরী 'তিতাস একটি নদীর নাম'-এর পাণ্ডুলিপি পড়লেন এবং লেখককে প্রশ্ন করেছিলেন- মানিক বন্দোপাধ্যায়ের লেখা উপন্যাস 'পদ্মানদীর মাঝি' বাজারে দারুণভাবে চলছে এই বই বাজারে থাকতে তোমার বই কাটবে কি ?

অধ্যাপক চৌধুরীর প্রশ্নের জবাবে আপাংক্তেও তথা হীনসমাজের লেখক অদ্বৈত মল্লবর্মণ বলেছিলেন- "সুবোধদা, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বড় আর্টিস্ট, মাস্টার আর্টিস্ট, কিন্তু বাওনের পোলা রোমান্টিক। আর আমি তো জাউলার পোলা"।[১৯]

অদ্বৈতের এই বক্তব্যের মধ্যে স্পষ্ট অর্থ ছিল এটাই যে, ইমাজিনেশন (Imagination) বা সিমপ্যাথি (Sympathy) দিয়ে যা লেখা যায়, এমপ্যাথি (Empathy) তার থেকে ভিন্ন মাপের শিল্প রচনা করতে পারে। আত্মস্মৃতি বা আত্মকথা হল সেই এমপ্যাথি মূলক বাস্তব শিল্পের নিদর্শন। এখানে সিমপ্যাথির কোন জায়গা নেই। লেখক তাঁর নিজের জীবনে সঞ্চিত যাবতীয় চড়াই উৎরাই থেকেই সৃষ্টি করেন এই সাহিত্য। কিন্তু এখানে এ কথা বলা আবশ্যক বাংলা সাহিত্যে প্রথাগত স্মৃতিকথার আড়ালে যে আর এক ধরণের ভিন্ন মেরুর আত্মকথা রয়েছে, যাকে আমরা দলিত আত্মজীবনী বলে জানি, এই দু-ধরনের লেখায় রয়েছে বিস্তর ফারাক। আদপে এই আত্মজীবনীতে থাকে কি ? সেখানে থাকে মূলত লেখকের 'আমি'। আপাতভাবে ভাবলে মনে হতেই পারে, যে এই 'আমি' তো অচেতন সৃষ্টি কিন্তু একটু গভীরভাবে ভাবলে দেখা যাবে যে আসলে তা নয়। বরং এই 'আমি' হল এক সচেতন 'নির্মাণ'। জীবনযাপনে আমরা যে 'আমি'কে দেখি ঠিক তেমনটাই উপস্থাপিত হয়না আত্মস্মৃতির পাতায়। বিশেষত প্রগতিশীল সাহিত্যে কৃতিজনের ক্ষেত্রে আত্মস্মৃতি বা আত্মকথা রচনার একটাই তাগিদ থাকে, সেদিনকার

'আমি' কীভাবে আজকের 'আমি' হয়ে উঠলাম উন্মুখ পাঠকের কাছে সেই রহস্য পরতে পরতে খুলে দেখানোর। আর যেহেতু আজ 'আমি' কৃতি তাই বিশেষ অভিনিবেশের বিষয় হয়ে ওঠে নিজের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যগুলি। সেইসঙ্গে কৃতি তথা বিত্তজনদের 'আত্ম' (Self) বিশেষভাবে ঢেকে রাখতে চায় জীবনের ভুলত্রুটি ও নঞর্থক দিকগুলি। কিন্তু যারা সমাজের কাছে অখ্যাত, সমাজ দ্বারা স্বীকৃত মানদণ্ডের বিচারে যারা কোনদিন কৃতিত্বের শিখরে পৌঁছতে পারে নি, সেইসব ব্যক্তি যখন আত্মকথা বা আত্মস্মৃতির মতো শিল্প-সাহিত্য নির্মাণ করেন তখন কিন্তু তারা 'আমি' হয়ে ওঠার গল্প লেখেন না। এমনকি নিজের 'আমি'র দোষ ত্রুটিকেও লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করেন না। তাঁরা আসলে তুলে ধরতে চান জীবনের সেই সত্যকে- রুঢ়, নির্মম বীভৎস বাস্তবতাকে। ফলে এইসব লেখকেরা তাঁদের সেই আত্মদর্পণে আসলে 'আমি'র স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যকে না খুঁজে সময়, সমাজ ও মানুষের দরবারে ন্যায় বিচারার্থে নিজের 'আত্ম'-কে প্রতিষ্ঠিত করতে চান। তাই যখন আমরা মনোরঞ্জন ব্যাপারীর ইতিবৃত্তে চন্ডাল জীবন পড়তে যাই ভূমিকা অংশেই চোখে পড়ে লেখকের সেই অকপট স্বীকারোক্তি-

> 'পাঠক বিশ্বাস রাখতে পারেন, বর্ণনার কোন স্তরে বিন্দুমাত্র সত্য থেকে বিচ্যুত হইনি বা বিকৃত করিনি। যেটুকু পারিনি সে আমার অপারগতা। তবে যেটুকু বলেছি-নিজে যা বিশ্বাস করি সেটাই উচ্চারণ করেছি উচ্চনাদে। ঋজু অকপটতায়'।[২০]

মানুষের কৃতিত্বের পরিমাপ হয় জীবনের যাত্রা শুরু আর শেষের মধ্যে কতটা দূরত্ব। যত বেশি দূরত্ব সে অতিক্রম করেছে তার দৈর্ঘ্যের উপর। কৃতীদের আত্মজীবনীতে তাই প্রায়শই দেখা যায়, যাত্রা শুরুর অবস্থানটাকে অনেক নীচে নামিয়ে, কৃতিত্বের স্বর্ণশিখরের উচ্চতাটাকে আরো বাড়িয়ে তোলার গোপন মনোগত অভীপ্সা। কিন্তু দলিত লেখকদের আত্মজীবনীতে এই প্রয়াস তথা অভীপ্সা একেবারে নেই বললেই চলে। নীচের সেই অবস্থানটাই তাঁদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ। কেননা কৃতিত্ব প্রকাশের জন্য তাঁরা লেখেন না। "জন্মগত কারণে অপরাধী ঘোষিত, অচ্ছুত অস্পৃশ্য দলিত বলে যাকে ভাবা হয় তার মধ্যেও যে এক গভীর সত্য বিরাজ করে, সেই সত্যকে- রূঢ় রুক্ষ নির্মম বাস্তবতাকে সমাজের কাছে চোখে আঙুল দিয়ে তুলে ধরাই তাঁদের মুল উদ্দেশ্য"।[২১]

তথ্যসূত্র

১. মনোহরমৌলি বিশ্বাস, *প্রবন্ধে প্রান্তজন অথবা অস্পৃশ্যের ডাইরি.* কলকাতা : চতুর্থ দুনিয়া, ২০১০.

২. তদেব.

৩. মনোহরমৌলি বিশ্বাস, *ভিন্নচোখে প্রবন্ধমালা.* গ্রন্থে উল্লেখিত, চতুর্থ দুনিয়া, কলকাতা- ৭৩

৪. অদ্বৈতমল্ল বর্মণ, তিতাস একটি নদীর নাম, 'চতুর্থ দুনিয়া' সাহিত্য পত্রিকার অদ্বৈতমল্ল বর্মণ বিশেষ সংখ্যা পৃষ্ঠা-১২

৫. ব্রজেন মল্লিকের প্রতিবাদপত্র, 'দেশ'; ১৭ ই জানুয়ারি, ২০০৬। (সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ওই কথাটি লেখেন শারদীয় 'দেশ' পত্রিকায় (২০০৫) প্রকাশিত তাঁর গল্পে। পরে অবশ্য তিনি এই ভুলের জন্য দুঃখপ্রকাশ করেছেন।)

৬. লুডভিক, হিবটগেনস্টাইন. 'নোটবুকস'. ১৯১৪-১৬. বেসিল ব্ল্যাকওয়েল, ১৯৬১ : পৃষ্ঠা-৪২)

৭. শ্যামল কুমার প্রামাণিক, (অনুবাদক) সিন্ধালিঙ্গাইয়া, *'কালো জঙ্গলের গান'*- কাব্যের কবিতার বাংলা অনুবাদ।

৮. চতুর্থ দুনিয়ার গল্প, বাংলা দলিত সাহিত্য সংস্থা কর্তৃক প্রকাশিত, ভবানী দত্ত লেন, কোলকাতা-২২

৯. গোবিন্দ শৌণ্ড, *'অনাদৃতা',* রামনগর, মেদিনীপুর ১৯৭৭

১০. বিশ্বাস, মনোহরমৌলি. *ভিন্নচোখে প্রবন্ধমালা.* চতুর্থ দুনিয়া, কলকাতা- ৭৩

১১. সনৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : *তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত জীবনী;* তারাশঙ্কর রচনাবলী (১ম খণ্ড), ১৩৯১ বঙ্গাব্দ। পৃ- ২৯

১২. তদেব

১৩. মনোরঞ্জন ব্যাপারী, *ইতিবৃত্তে চণ্ডাল জীবন.* মুলপাঠ, ভূমিকা অংশ, পৃ- ৫

১৪. হিমবন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় : গল্প নিয়ে উপন্যাস নিয়ে ; প্রবন্ধ তারাশঙ্করের 'কবি' : অন্তহীনতার খোঁজ, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ১৪১২ বঙ্গাব্দ, পৃ-১৩৩

১৫. তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়: কবি ; শ্রেষ্ঠ উপন্যাস, অবসর, ঢাকা, ১৯৯৯.

১৬. তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় : *কবি ; শ্রেষ্ঠ উপন্যাস,* অবসর, ঢাকা, ১৯৯৯, পৃ.

১৭. সমরেশ মজুমদার, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদ্মানদীর মাঝি,* রত্নাবলী, ১৯৯৭, পৃ- ১৫

১৮. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : *লেখকের কথা,* প্রথম প্রকাশ, পৃ-২৩-২৪ ; বিকল্প সূত্র : সমরেশ মজুমদার : মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় পদ্মানদীর মাঝি, রত্নাবলী, ১৯৯৭

১৯. সুবোধ চৌধুরী : সাক্ষাৎকার, চতুর্থ দুনিয়া, ডিসেম্বর, ১৯৯৪

২০. ব্যাপারী, মনোরঞ্জন. *ইতিবৃত্তে চণ্ডাল জীবন.* মুলপাঠ, ভূমিকা অংশ, পৃ- ১২

২১. তদেব. পৃষ্ঠা-১৫

তৃতীয় অধ্যায়

দলিত আত্মপরিচয়ের সংকট

গোষ্ঠীবদ্ধ-ভাবে বসবাস করার ভিতর দিয়ে গড়ে ওঠে মানুষের সমাজ। সমাজের প্রতিটি ব্যক্তিরই আছে আলাদা আলাদা সত্তা। প্রতিটি মানুষই সমাজ নির্মাণের এক একটি উপাদান। একটি উপাদানের সঙ্গে আরেকটি উপাদানের আছে বহুবিধ আন্তঃসম্পর্ক। এই সম্পর্ক কখনও সরল আবার কখনও জটিল। আর সেজন্যই 'সাংস্কৃতিক ও আর্থিক ক্ষেত্রে গড়ে ওঠে এক প্রতিযোগিতা। আন্তঃসম্পর্কের সুদৃঢ় ভিতে ধরায় ফাটল'।[১] আন্তঃসম্পর্ক ভাঙ্গা-গড়ার খেলায় প্রভাব বিস্তার করে থাকে ভৌগোলিক পরিবেশ, স্থানীয় জলবায়ু, গ্রাসাচ্ছাদনের সুযোগ সুবিধা প্রভৃতি বিষয়। ব্যক্তি উন্নয়ন, গোষ্ঠী উন্নয়ন আবার কখনও কখনও শ্রেণিগত উজ্জ্বল পরম্পরা সৃষ্টি করতে গিয়ে জন্ম হয় অবাঞ্ছিত প্রতিযোগিতার। প্রতিযোগিতায় যারা সামনে থাকেন তাঁরা ধরে রাখতে চান নিজেদের অবস্থান। পিছনে-থাকাদের মধ্য থেকে কেউবা আবার চলে আসেন সামনে এবং সামনে থাকাদের মধ্য থেকে কেউ বা আবার চলে যান পিছনে। একদল আবার পিছনে পড়তে পড়তে অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার সংকটের মধ্যে পড়েন। আর সেজন্যই ঔপনিবেশিক বাংলায় এমন এক সময় এল, যখন দেখা যায় মাটির সোঁদা গন্ধের সঙ্গে মিশে থাকা, মাটিকে আঁকড়ে বেঁচে থাকা মানুষ আর তার নিজের 'আত্মপরিচয়' নিয়ে সন্তুষ্ট থাকছেন না। বৈদ্য থেকে শুরু করে একে একে কায়স্থ- তেলি- মালি- শুঁড়ি- নমঃশূদ্র- কৈবর্ত প্রত্যেকের মধ্যে প্রয়াস চলছে বৈদিক বিশুদ্ধ আর্য রক্তের উত্তরাধিকারী হয়ে ওঠার। উনিশ শতকে আত্মোন্নয়নের প্রয়াস প্রতিটি জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে আলাদা আলাদা ভাবে লক্ষ্য করা যায়। আর সেই সঙ্গে বাড়তে থাকে বিশুদ্ধ আর্য রক্তের উত্তরাধিকারের দাবিও। এই আর্যত্বের অহংকার শহর-কেন্দ্রিকতা ছাড়িয়ে গ্রামগঞ্জের মাটিকেও ব্যাপকভাবে স্পর্শ করে। উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সম্প্রদায়, দক্ষিণবঙ্গের পৌন্ড্র, পশ্চিম বঙ্গের মাহিষ্য এবং পুর্ব ও মধ্যবঙ্গের নমঃশূদ্ররা জনসংখ্যার বিচারে স্বকীয় অস্তিত্বে শক্তিমান হয়েও তাঁরা ভীষণভাবে আত্মপরিচয়ের সংকটে আক্রান্ত হয়ে পড়তে থাকেন। আত্মপরিচয়ের (Identity) এই সংকট তাঁদেরকে দাসত্বের মন্ত্রে মাথা নিচু করতে শেখায়। জন্মের অভিশাপে কিংবা আশীর্বাদে বিচিত্র এই ভারতবর্ষে মানুষ ছোট হন অথবা বড় হন। জন্মের অভিশাপে অথবা আশীর্বাদে এই দেশের হিন্দু ধর্মে মানুষ ব্রাহ্মণ হন কিংবা শূদ্র হন। একদিকে

জন্মের পূণ্য ছুঁয়ে মানুষ হতে পারেন সম্পদ ও শিক্ষার অধিকারী। আবার অন্যদিকে জন্মের কলঙ্ক ছুঁয়ে মানুষ চিরকাল থেকে যান দরিদ্র ও নিরক্ষর। জন্মলগ্নে নির্ধারিত হয় মানুষের কাস্ট (Caste)। তাই তাকে বহন করতে হয় আজীবন। কাস্ট-ই নির্ধারণ করে জন্মকে, ফলে কারও কাছে জন্ম পুণ্যের, কারও কাছে পাপের কলঙ্ক। এই কলঙ্ক থেকেই জন্ম হয় দাসত্বের মনোভাব। দাসত্ব একটা মনোবৃত্তি। জন্ম জন্মান্তর ধরে চলে আসা অবদমনের ফলে দাস্যতা মিশে আছে দলিত জনগোষ্ঠীর মানুষের রক্তে। কোন জাতে জন্ম তা এদেশে মানুষের জীবন ও জীবিকায় অন্বিত হয়ে একটা বড় ভূমিকা পালন করে। জন্মের অভিশাপ মাথায় চেপে বসে থাকে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর মানুষের। আর সেজন্যই এই অভিশাপ থেকে তথা নিজের হীনমন্যতা থেকে মুক্তি পাওয়ার আশায় ব্রাহ্মণত্বের মধ্যে যোগ দিতে গিয়েই আত্মপরিচয় বিক্রি হয়ে যাবার বোধে তাঁরা আক্রান্ত হয়েছেন, এবং এক মিথ্যা গরিমায় আকৃষ্ট হয়েছেন। আর সেই গরিমা ছুঁতে গিয়ে শূদ্র জনগোষ্ঠীর কোনও কোনও সম্প্রদায় উপবীত গ্রহণের বিশাল আকারের অনুষ্ঠান করেছেন। যেমন- '১৯১২ সালের ২৭ শে মাঘ করতোয়া নদীর তীরে মহামিলন ক্ষেত্রে ব্রাত্যত্ব মোচনের যজ্ঞানুষ্ঠানে উপবীত গ্রহণ হয়। রংপুর, জলপাইগুড়ি, কুচবিহার এবং গোয়ালপাড়া জেলাতেও স্থানে স্থানে ১৯২ টি মিলন সংসদে ব্রাত্যত্ব মোচনের অনুষ্ঠান হয়'।[২]

আবার কোনও কোনও সম্প্রদায় দাবি তুলেছেন ক্ষত্রিয়ত্বের। কেউ কেউ নিজেকে খোদ ব্রাহ্মণ শ্রেণির মানুষ বলে এবং ওড়িষ্যার মৈথিলী ব্রাহ্মণ বলে প্রমাণ করার আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন।[৩] তবে এটা শুধুমাত্র শূদ্রদের ক্ষেত্রেই নয়। বৈদিক আর্য রক্তের উত্তরাধিকারী হওয়ার চেষ্টা বাঙালির প্রায় সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে প্রবেশ করে তাঁদের প্রত্যেকের নিজস্ব সত্তাকে পঙ্গু করেছে, আপন আত্মপরিচয়ের তথা আপন অস্তিত্বের লড়াইকে ক্ষীয়মাণ করে তুলেছে।

সময় বদলের সঙ্গে সঙ্গে বাঁকবদল ঘটেছে আত্মপরিচয়ের ইতিহাসে। যারা একসময় ব্রাহ্মত্ত্বের কড়া নাড়তে প্রয়াসী থেকেছেন, বর্তমান সময়ে লক্ষ্য করলে দেখা যায় তাদের একটা অংশ আছেন যারা ব্রাহ্মত্ত্বের মধ্যেই থাকতে চান। এই অহংকারের মাধ্যমে তারা একপ্রকার আত্মতুষ্টি লাভ করেন। তেমনি অন্যদিকে আবার একটা বিশাল অংশের জনগোষ্ঠীর মানুষ আত্মপরিচয়ের রূঢ় বাস্তবতার মধ্যে দাঁড়িয়ে অন্তহীন কালের বঞ্চনা-লাঞ্ছনার কঠিন সত্যকে সঙ্গে নিয়েই বয়ে বেড়াচ্ছেন আজীবন। ব্রাহ্মণ্যমনস্কতাকে সরাসরি চ্যালেঞ্জে রেখে 'দলিত'–এই আত্মপরিচয়েরই লড়াই করছেন তাঁরা। আর তাঁদের এই লড়াই

আত্মপরিচয়ের ইতিহাসে এক নতুন মাত্রা সংযোগ করে চলেছে। "দলিত হলেও হীনমন্যতা নেই তাঁদের। হীনমন্যতা ত্যাগ করে মাথা উঁচু করে ভারতের সমাজ ব্যবস্থায় বাঁচতে শেখেন তাঁরা"।[৪] ভৌগোলিক বাংলার ভূমিজ সন্তানদের দ্রাবিড়ি রক্তের আত্মপরিচয়ের ইতিহাস দিয়ে পালাবদল ঘটে চলেছে বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির ইতিহাসে। ঔপনিবেশিক বাংলায় সাহিত্য ও সংস্কৃতির ধারা গড়ে উঠেছে মূলত বৈদিকতার থেকে ঋণ নিয়ে। ধর্মগ্রন্থ (Religious Scripture) আহূত দর্শনকেই সেখানে প্রবাহমানতার মূল স্রোত হিসেবে ভাবা হত। স্বাভাবিকভাবে দ্রাবিড়ি রক্তের ঐতিহ্যকে সম্বল করে গড়ে ওঠা যে আত্মপরিচয়, তাকে প্রতিনিয়তই বাধা, প্রত্যাখ্যান ও সংকটের মুখে পড়তে হয়। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির ধারায় কিন্তু আত্মপরিচয়ের এই সংকট ছিল না। সেখানে সাহিত্যের মূলধারায় বিরাজ করত বহুজনের জীবন ও সংস্কৃতি। বাংলা সাহিত্যের ঊষালগ্ন বলে পরিচিত যে চর্যাপদের কাল, সেই কালও ছিল দ্রাবিড়ি রক্তের আত্মপরিচয়ের অধিকতর স্বাচ্ছন্দ্যের একটি যুগপর্ব। তাঁরাই বিরাজ করতেন কেন্দ্রীয় ভূমিকায়। সেখানে ছিল না কোনও সঙ্কোচ, ছিলনা হীনমন্য হয়ে যাবার এতটুকুও স্থান। ব্রাহ্মণ্যবোধিসত্তা থেকে ছিল না কোনও পারিপার্শ্বিক চাপও। মুষ্টিমেয় কিছু মানুষের মুখের ভাষায় রচিত সাহিত্যের যে ধারাটি তখনকার সময়ে সারা ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল এবং সেই সময়ের আগেও যার প্রাবল্যের অস্তিত্ব ছিল সারা ভারতময়, বাংলার মানুষের কাছে তা কোনও আকর্ষণের বিষয় হয়ে ওঠেনি। আর তাঁদের সেই সাহিত্য এবং সেই মুষ্টিমেয় মানুষের বিশুদ্ধ আর্য রক্তের উত্তরাধিকারী হওয়ার ঝোঁকও মধ্য যুগপূর্ব ভারত চর্চার ইতিহাসে বাংলায় কোনও মানুষের মধ্যে প্রত্যক্ষ করা যায়নি। অথচ বাংলায় আত্মপরিচয়ের সংকটের ইতিহাস যুগে যুগে বদলেছে। একদা যা সঙ্কট ছিল না, বর্তমান সময়ে তাই বড় সঙ্কট, প্রবল সঙ্কট। আধুনিকতা এবং উত্তর আধুনিকতার চাপে এর বদলাচ্ছে রঙ, বদলাচ্ছে অভিমুখ।

এ বিষয়ে একটা উদাহরণ দিলে তা বোঝা যাবে। ২০০৫ সালে ১৬ ও ১৮ই ডিসেম্বর পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক লেখক-শিল্পী সংঘের ৬ষ্ঠ সম্মেলন হয় রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়ামে। সম্মেলনের ঘোষণাপত্রের ৬ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে 'বাংলার তথাকথিত বুদ্ধিজীবীরা বলেন উদার এক অসাম্প্রদায়িক পরিমণ্ডলের ক্ষেত্র বাংলা গড়ে উঠেছিল উনিশ শতকের মূলত উচ্চবর্ণীয় মনীষীদের নবজাগরণের ফল হিসাবে'। এই আত্মতৃপ্তিমূলক ঐতিহাসিক বিশ্লেষণের ভুল হল এই যে, নবজাগরণের কাজকর্ম ছিল মূলত নগরকেন্দ্রিক। তা ছিল মুষ্টিমেয় জনের তথা কেবলমাত্র সমাজের এক ক্ষুদ্রাংশ ব্যক্তির মধ্যে বিরাজিত।

ধর্মের অন্তঃস্থলের কুসংস্কার দূরীকরণের দিকে তাঁদের দৃষ্টি যতটা ছিল, ধর্মান্ধতা ভেঙ্গে অসাম্প্রদায়িক মনস্কতা নির্মাণের দিকে ততটা যত্ন ছিল না। তাই বাংলার উদার অসাম্প্রদায়িক পরিমণ্ডলের ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে নবজাগরণের আন্দোলনের মনীষীদের থেকে গ্রামগঞ্জের হিন্দু-মুসলমান নিম্নবর্গের প্রান্তিক মানুষের ভূমিকা অনেক বড়। ১৭৮৯ থেকে ১৯০০ সাল অবধি নিম্নবর্গের মানুষেরা প্রায় শতাধিক কৃষক বিদ্রোহের ভিতর দিয়ে আত্মপরিচয়ের যে সংগ্রাম করেছিলেন তাকে তুচ্ছ বলে দূরে সরিয়ে রাখা যায় না। সেই সময়ে যা ছিল তুচ্ছ, সময়ের বিচারে তা মহত্ব পেয়ে যেতে থাকে। আত্মপরিচয় ও আত্মজাগৃতিকে উন্মোচিত করে। বাংলার কৃষক বিদ্রোহগুলি নতুন করে মানসিক চেতনার কোষগুলিকে জাগিয়ে তোলে। সর্বদেশে সর্বকালে খ্যাতিহীন জনগণ হয়ে ওঠেন সকল খ্যাতির দাবিদার। দলিতরা তাই শ্রেণীতত্ত্বের বিশ্লেষণে ধনহীন হয়েও তাঁরা সংখ্যায় বিপুল বলেই সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে দেশের মূল স্রোত এমন দাবি করছেন এই সময়ে। মূল স্রোতের এইসব মানুষদের কখনও প্রয়োজন পড়েনি 'বহুপত্নী' গ্রহণের মত সামাজিক ব্যাধি দূরীকরণের নিমিত্ত কোনও আন্দোলন করার। কখনও প্রয়োজন পড়েনি পারিবারিক সম্পদ ও আভিজাত্যকে বজায় রাখতে মৃতের বিধবাকে তাঁর স্বামীর চিতায় আগুনে পুড়িয়ে মারার। কেননা তাঁদের নতুন করে পথ দেখানোর জন্য রামমোহন কিংবা বিদ্যাসাগরের মত কোনও মহাপুরুষের দরকার হয়নি। ইতিহাসের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করলে এর দুটি কারণ আমাদের নজরে আসে।

প্রথমত দ্রাবিড়ি রক্তের উত্তরাধিকারের মধ্যে আর্য ধর্মশাস্ত্রগুলির প্রতি তাঁদের আনুগত্যের অভাব লক্ষ্য করা যায়।

দ্বিতীয় যে কারণটি তা আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তা হল বহুবিবাহের বিলাসিতা কেবল বর্ণগত কৌলীন্যের অঙ্গাতিশয্যের একটি বিষয় মাত্র নয়। সামাজিক ভারসাম্যে অর্থনৈতিক আধিপত্য যাতে অক্ষুণ্ণ থাকে সেই প্রক্রিয়াও এতে বিদ্যমান। ফলে সম্পদজাত যে সুখ তার ব্যাপ্তির বহিঃপ্রকাশ বর্ণের মধ্যে অঙ্গে অঙ্গে মিশে থাকে, যার সঙ্গে নিম্নবর্ণের মানুষের কোনও যোগ থাকে না।

বাংলার যারা আত্মপরিচয়ের ঔজ্জ্বল্যের সুদীর্ঘ ইতিহাসগত চর্চায় এতকাল গৌরব বোধ করেছেন বলে জানা আছে, নিম্নবর্গের ইতিহাসকেও কিন্তু বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে, তাকে কোনও ভাবে খাটো করে দেখার বিষয় হয়ে ওঠেনি। তাই একদিকে যেমন আত্মপরিচয়ের পর্ব থেকে পর্বান্তরে যাওয়ার ইতিহাস সম্মানিত হচ্ছে তেমনি অন্যদিকে এর ভিতর দিয়ে আত্ম-বঞ্চনাকে প্রশস্ত করেছে আবার।

নিম্নবর্গের বহুমুখী সদিচ্ছামূলক কর্মকাণ্ডগুলিকে আড়াল করার ভেতর দিয়ে এই আত্মবঞ্চনার ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েছে। একথার সত্যতা প্রমাণ করতে হলে বাংলার আত্মপরিচয়ের ইতিহাস থেকে একটি উদাহরণ দেওয়া আবশ্যক। যেমন-

> ''উনিশ শতকের বাংলার নবজাগরণ চলছিল শহরকে কেন্দ্র করে। তা ছিল আসলে একটা সংস্কার-মুখী আন্দোলন। বাংলার মাটিতে শ্রমিক শ্রেণি নিয়ে কোনও ভাবনা তখনও স্থান পায়নি। তখনকার শ্রমিক-শ্রেণি বলতে বাংলার চাষি-শ্রমিকদেরই বোঝাত কেবল। তথাকথিত এই শ্রমিক-শ্রেণির মধ্যে তখনও নানা কারণে অসন্তোষ ছিল। সামন্ত মালিকদের প্রতি এবং তাঁদের মদতদাতা সরকারের প্রতি সেই অসন্তোষ দিন দিন বেড়ে চলছিল। উনিশ শতকের সাতের দশকের গোড়ায় (১৮৭৩) তাঁরা ফরিদপুর, বরিশাল, যশোহর, খুলনা জেলার বিস্তৃত অঞ্চলে এক সাধারণ ধর্মঘট ডাকলেন''।[৫]

সেই ধর্মঘটের বিচার বিশ্লেষণ করে দেখলে দেখা যায় এর ভিতর থেকে যে সত্য প্রকাশিত হয় তাও কিন্তু আত্মপরিচয়ের একটা চমৎকার পর্ব। আর এই পর্বের সম্পর্ক মূলত অন্বিত ছিল শূদ্র সমাজের সঙ্গে। 'চণ্ডাল' নামের তখনকার ওই 'এথনিক আইডেনটিটি'র (Ethnic Identity) জনগোষ্ঠী পরবর্তী সময়ে ইতিহাসের এক ভিন্ন লড়াইও লড়েছেন। তাঁদের ভিতরকার বুদ্ধিজীবীদের একটা অংশ 'চণ্ডাল' এই এথনিক আইডেনটিটিকে অবমাননাকর এক আত্মপরিচয় বলে ভাবতেন। এবং এই অবমাননাকর আত্মপরিচয় মুছে ফেলার জন্য শুরু করেছিলেন তিনদশক ব্যাপী এক সামাজিক আন্দোলন।

ধর্মীয় বিশ্বাসের জাল ছিন্ন করে মানুষকে মুক্ত চিন্তার একজন মানুষ তৈরি খুবই কঠিন কাজ। আমরা জানি ভারতে দলিতরা দুর্বলতম জনগোষ্ঠী। তাঁদের বর্ণপরিচয়ের কারণেই তারা যুগ যুগ ধরে সামাজিক অর্থনৈতিক জীবনে মূলস্রোতের বাইরে ছিল। সেই হীনমন্যতার বোধে আক্রান্ত হয়ে তাঁদের আত্মপরিচয় বদল করতে গিয়ে সংকটের সৃষ্টি হয়। দেশভাগ বাঙালির আত্মপরিচয়ের অখণ্ডতাকে প্রবলভাবে আঘাত করেছে। দেশভাগের ফলে বাঙালির আত্মপরিচয় খন্ডিত হয়েছে বলে যা ভাবা হয় আসলে তার মধ্যে প্রকৃত সত্য হল এই যে, ভৌগোলিক বিভাজন দিয়ে কখনও আইডেনটিটিকে ভাঙা যায় না। আইডেনটিটিকে কেন্দ্রবিন্দুতে রেখে তার ভিতরে যে ঐক্যবদ্ধ শক্তি গড়ে ওঠে, ভৌগোলিক বিভাজন সেই শক্তিকে ভেঙে টুকরো টুকরো করে দিতে পারে। আবার কখনও অন্তরের শক্তিকে ক্ষীণ, দুর্বল,

কখনও বা পঙ্গু করে দিতে পারে কিন্তু তাকে অস্তিত্বহীন করতে পারে না। স্বকীয় অস্তিত্বের নিঃশেষিত হয়ে যাওয়ার মধ্যেও বাঁচতে শেখায় এই আইডেনটিটি। এ এক অতীত ঐতিহ্যের বহমান অহংকারের আশ্রিত অংশ। দেশভাগ দিয়ে আত্মপরিচয় ভাঙেনি, আত্মপরিচয়ের কীটদষ্ট ফসল দিয়ে ভেঙে গেছে দেশ। বিভাজন ঘটেছে জাতিসত্তার। "আত্মপরিচয়ের শরীরের ছায়ায় অস্পৃশ্যতার মালিন্য-মাখা মানুষ যদি অবস্থান না করতেন বাঙালির আত্মপরিচয়ের মধ্যে কথাও কোনও সংকট থাকত না"।[৭] আরও সহজ ভাষায় বললে বলা যায়, 'বাংলার আর্যভাবাপন্ন হিন্দু শাসক শ্রেণি অস্পৃশ্যদের জন্য আগ্রহ দেখাননি, এবং তাঁদের সাথে সম্পর্ক যে-সব দেশজ উপাদানের, তা দিয়ে তাঁদেরকে নতুন ভাব ও ভাষার সাহিত্যের ভাণ্ডারও গড়ে তোলার উৎসাহ জোগান নি"।[৬] আর্যসভ্যতার অহংসর্বস্ব আধিপত্যের নিচে চাপা পড়ে দেশজ উপাদানের সাহিত্য ও সংস্কৃতির মৃত্যু ঘটেছে। ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েছে একের পর এক আধিপত্যবাদের। ফলে ভিতরের এক চাপা ক্রন্দন থেকে সূত্রপাত হয়েছে অনৈক্যের। আত্মপরিচয়ের ভিতরকার সংহতির শক্তি কমতে কমতে কোনও এক সময়ে বাংলার ঔপনিবেশিক শাসনের অবসান হয়েছে বিভক্ত বাংলার বাস্তবতাকে মেনে নিয়ে। তা কীভাবে ঘটল একটুখানি বিশ্লেষণ করলেই বিষয়টি বোঝা যাবে। তথাকথিত ঐতিহাসিকরা প্রায় সকলেই বাংলা ভাগের কারণ বলতে গিয়ে 'দ্বিজাতিতত্ত্ব' দিয়ে বিশ্লেষণ করেন।

আত্মপরিচয়ের ঠিকানা খুঁজতে গিয়ে একথা লক্ষণীয় হয়ে ওঠে যে, হিন্দু ও মুসলমান যেমন এ বিষয়ে এক হয়ে ওঠেনি তেমনি হিন্দুদের উচ্চবর্গ ও নিম্নবর্গও এক হয়ে ওঠেনি। দেশভাগ দিয়ে আত্মপরিচয় ভাঙেনি, আত্মপরিচয়ই ভেঙেছে দেশ। তাই স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে ভারতবর্ষের বাংলা খন্ডেও দেখা যায় কোনও কোনও অঞ্চলে 'সেলফ আইডেনটিটি নিম্নবর্গের হিন্দুদের মধ্যে আত্মমর্যাদার পোশাক পড়ে লড়াই করছে এবং সে লড়াইয়ের কাছে স্বাধীনতা বড়, দেশভাগ গৌণ। বিচক্ষণতা ও বুদ্ধি 'দলিত' আত্মপরিচয়কে ঘুমপাড়ানি গান শোনাতে পারে কিন্তু ঘুম পারিয়ে দিতে পারে না। আর পারেনা বলেই তাদের আত্মপরিচয় কখনও কখনও হয়ে ওঠে বিদ্রোহ, আগুনের মশাল জ্বালিয়ে অবাঞ্ছিত উত্তাপ বিকিরণ করে। আবার কখনও কখনও শান্তির শ্বেত পতাকা উড়িয়ে মিলনের রাস্তা খোঁজে। আর তাই দেশের বিভিন্ন স্থানে বিচ্ছিন্নতার আন্দোলন বলে যা প্রতিভাত হয় আসলে তা এদেশের আত্মপরিচয়ের সংকট ছাড়া আর কিছুই নয়।

দলিত মানুষের এই বিষাদময় ভবিষ্যৎকে এক দ্রষ্টার দৃষ্টিতে দেখতে পেয়েছিলেন ড. বি আর আম্বেদকর। বর্ণ-হিন্দুদের মেজাজ ও মানসিকতা এই স্বাতন্ত্র্যের সীমায় আনয়নের ভিতর দিয়ে ইতিহাসের নব নির্মাণ করেন তিনি। দলিত মানুষের মুক্তির পথ বলে দিয়েছিলেন তিনি নিজেই। বলেছেন- 'যদি আত্মসম্মান চাও, ধর্ম পরিবর্তন কর। যদি সহযোগিতা পূর্ণ সমাজ চাও, ধর্ম পরিবর্তন কর। যদি ক্ষমতা চাও, ধর্ম পরিবর্তন কর।. . . আজীবনের চেষ্টায় ধর্মের বর্ণ-বিন্যাসের অচলায়তন এক ইঞ্চিও নাড়ানো সম্ভব হয়নি যখন, দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে অবশেষে মৃত্যুর মাত্র কিছুদিন আগে তিনি জানিয়ে ছিলেন হিন্দু ধর্ম ত্যাগ করার কথা। আধুনিক ভারতে দলিত মানুষের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা ও আত্মপ্রত্যয় স্থাপনের আন্দোলন প্রণিধানযোগ্য করতে এইসব কথা বলেছিলেন তিনি। সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনের মাধ্যমে অবদমিত জাতি সমূহের মানুষকে শিক্ষিত, সংঘটিত ও রাজনৈতিক দিক থেকে তাৎপর্যপূর্ণ করে গড়ে তুলতে বলেছিলেন এইসব কথা।

আত্মপরিচয়ের আর এক বাঁকবদল লক্ষ্য করা গিয়েছিল ঔপনেবেশিক শাসনের বর্ণহিন্দু বিচারপতিদের আচার আচরণের মধ্যে। নিম্নবর্ণজাত মানুষ যেন আত্মপরিচয়ে কোনও প্রকারের মান-মর্যাদার অধিকারী হতে পারেন না, এবং পারেন না বলেই যে কোনও প্রকারের ঘৃণ্য কাজ তাঁরা সহজেই করতে পারেন এমন আত্মপরিচয়ে বিশ্বাসী ছিলেন বিচারপতিরা। বর্ণগতভাবে গড়ে ওঠা মানুষের আত্মপরিচয়ের এমন এক বিচার ধারার বশবর্তী হয়ে বিচারপতিরা সাক্ষ্যপ্রমাণ ছাড়া কখনও কখনও তাঁদের রায়ও দিয়ে দিতেন। একটি উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি বোঝানো যাক, 'বরিশালের সামান্য এক নৌকো চুরির ঘটনায় সাজাপ্রাপ্ত এক নমঃশূদ্র অভিযুক্ত ব্যক্তি উচ্চতর আদালতের দ্বারস্থ হলে সদ্য আই. সি. এস হয়ে আসা তরুণ বিচারপতিকেই তাঁর অনুমান ভিত্তিক রায় দান ঠিক নয় বলে বলা হয় এবং পরিণতিতে আই. সি. এস এর চাকরি হারান তিনি'।[৭]

কোনও এক সময়ে হুগলীর জেলা শাসক ছিলেন এইচ জি কুক। দেশীয় অনেক বিচারপতির আত্মপরিচয় কেন্দ্রিকতা থেকে বিচারের সাজায় তারতম্য ঘটে যাচ্ছে এমনটা নজরে এসেছিল তাঁর। একই রকমের অপরাধে নিম্নবর্ণের হিন্দু অথবা মুসলমানদের ক্ষেত্রে সাজায় তেমন তারতম্য থাকত না। অথচ তথাকথিত ভাষায় যারা 'ভদ্র' অথবা 'সম্ভ্রান্ত' বলে চিহ্নিত, বিচারপতিরা তাঁদের মার্জনার চোখেই দেখতেন। জেলার বিচার ব্যবস্থা নিরপেক্ষ হয়ে কাজ করছে না এবং সামগ্রিকভাবে ভারতীয় বিচার

ব্যবস্থার ত্রুটির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে একখানি দীর্ঘপত্রে[৮] তিনি তাঁর ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। তিনি একথাও বলেছিলেন তাঁর পত্রে যে জেলাশাসক হিসাবে সকলকে ন্যায়বিচার প্রদান তাঁর কর্তব্যের অন্তর্গত। আত্মপরিচয়ে ধর্মে ধর্মে আলাদা হয়ে যাওয়া মানুষ, আত্মপরিচয়ে বর্ণে বর্ণে আলাদা হয়ে যাওয়া মানুষ আইনের চোখে সমান। শিকড়ের বিন্যাস করে আইন কলুষিত করা যায় না।

আত্মপরিচয়ের ক্রমবিকাশের ধারা শুধু বাঙ্গালিদের নয়, এ ধারা মানুষের সমাজের অন্তর্গত এক শাশ্বত বিষয়। প্রতিটি মানুষের আত্মপরিচয় তাঁর আত্মবিকাশের সঙ্গে সম্পর্কিত। আত্মপরিচয়ের মধ্যে মিশে থাকে এক সুস্থ অহংকার। তা তাঁকে নিয়ত মহিমান্বিত করতে চায়। ব্যক্তির আত্মপরিচয় দিয়ে গড়ে ওঠে পারিবারিক আত্মপরিচয়। পারিবারিক আত্মপরিচয় দিয়ে গড়ে ওঠে গোষ্ঠী-গত আত্মপরিচয়। এই আত্মপরিচয় সুসংহত মানবিক কল্যাণের দিকে নিয়ে যেতে যেতে রাষ্ট্রিক বোধ গড়ে ওঠে। তাই পরবর্তীকালে ‘নেশন’ হিসাবে পরিচিতি পায়। বিশ্বমানবের আত্মরক্ষার জন্যই আজ প্রয়োজন হয়ে পড়েছে ব্যক্তির আত্মপরিচয়ের এমন এক সম্প্রসারণ। আর সেই সম্প্রসারণই সংকীর্ণ রাষ্ট্রীয় দ্বন্দ্বের ঊর্ধ্বে গিয়ে তাঁর মানবিক পরিচয় হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এইভাবে আশাভঙ্গের মনস্তাপ নিয়ে পার হয়ে যায় সময়। একের পর এক লেখা হতে থাকে স্বপ্নভঙ্গের দিনলিপি। অতীতের থেকে অনাদি কালের সীমানা পর্যন্ত।

তথ্যসূত্র :

১. শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিজিৎ দাশগুপ্ত সম্পাদিত, জাতি, বর্ণ ও বাঙালি সমাজ, আই. সি. বি. এস (দিল্লি), সিরিজ ২৪, ১৯৯৮, পৃ-৩০-৩৪

২. ঠাকুর পঞ্চানন বর্মার জীবন চরিতের ‘প্রস্তাবনা’, উপেন্দ্রনাথ বর্মণ, চতুর্থ সংস্করণ- ১৪০৮।

৩. ড. নন্দদুলাল মোহান্ত, মতুয়া আন্দোলন ও দলিত জাগরণ, পি. এইচ. ডি গবেষণা পত্র, ১ম সংস্করণ, মার্চ ২০০৪, পৃ-৪০৩

৪. সুনীল কুমার দাস, রাঢ়ের আদিম বাউড়ী জনগোষ্ঠী এবং তাঁদের প্রাচীন বৌদ্ধতন্ত্র’ গ্রন্থের নিবেদন অংশ, পৃষ্ঠা-৬

৫. উপেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, দ্য স্ট্রাইক, ইনভেস্টিগেটিভ মিডিয়া কর্তৃক প্রকাশিত ভূমিকা, কলকাতা, ২০০৪

৬. সঞ্জয় ভট্টাচার্য, ‘বাঙালি ও বাংলা সাহিত্য’ প্রবন্ধ।

৭. এস. কে. বিশ্বাস, ভারতীয় সমাজ উন্নয়নের ধারা ড. আম্বেদকর, ১ম সং ১৯৯১।

৮. কমিশনার বর্ধমান ডিভিশন-কে উদ্দেশ্য করে লেখা পত্র নং ১২৭৫ তাং আগষ্ট ৯-১১ ১৮৯০.

৯. জয়া চ্যাটার্জী, ‘বেঙ্গল ডিভাইডেট’, দ্য কনস্ট্রাকশন অব ভদ্রলোক কমিউনাল আইডেনটিটি, প্রবন্ধ.

১০. চিত্ত মণ্ডল ও প্রথমা রায়মন্ডল. বাংলার দলিত আন্দোলনের ইতিবৃত্ত, একুশ শতক, কলকাতা-৭০০০৭৩, ২০১৬

১১. অশোক মিত্র, প্রবন্ধঃ বহু জাতি-ধর্ম-বর্ণ-শ্রেণী ভিত্তিক সমাজে সমতা ও মানবধিকার, ‘জিজ্ঞাসা’ পত্রিকা, ১৬বর্ষ প্রথমসংখ্যা, পৃ-৯

চতুর্থ অধ্যায়

আত্মকথার দর্পণে দলিত নারী ও ভারতীয় সমাজ

ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে লিঙ্গগত শোষণ :

সারা বিশ্ব জুড়েই নারীরা নানাবিধ বাধার সম্মুখীন হচ্ছে। এবং সেইসঙ্গে ব্যাপকভাবে লঙ্ঘিত হয় তাদের অধিকার। লিখিত ইতিহাসের অধিকাংশ সময় জুড়েই নারীদের অবদমিত অবস্থায় দেখা যায়। যে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশে নারীরা রয়েছে সেটা দিয়ে আসলে নারীদের অবদমনের মাত্রার কমবেশি হয়। ভারতের ক্ষেত্রে তা বিশেষভাবে সত্য। ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে দেখা যায় যে, ভারতের নারীরা দীর্ঘকাল ধরে ব্রাহ্মণ্যবাদী দমনের শিকার। চিরাচরিত হিন্দু শাস্ত্রগুলিতে নারীরা পুরুষদের অধীন অবস্থানে রয়েছে। নারীদের যৌনতার উপর নিয়ন্ত্রণ জাতি সবর্ণ বিবাহ ব্যবস্থার ভিত্তি। বিভিন্ন জাতির মধ্যে যাতে অসবর্ণ বিবাহ না ঘটে সেজন্য স্ত্রী-পুরুষকে কঠোরভাবে আলাদা করে রাখা হয়েছিল এবং নারীদেহের উপর নিয়ন্ত্রণ ছিল এর মর্ম বস্তু। তারা যেন 'পাপের' পথে চলে না যায়, সেজন্য সতীত্ব, শিশু বিবাহ ও নারীদের উপর কঠোর নিয়ন্ত্রণের ধারণা চালু করা হয়েছিল। শৈশবে নারী পিতার অধীন, যৌবনে স্বামীর অধীন এবং বার্ধক্যে পুত্রের অধীন- এটাই ছিল নারীর ভাগ্য।

জাতিব্যবস্থা ও পিতৃতন্ত্রের দ্বারা নারী অবিরাম নিষ্পেষিত হয়েছে। নারীবাদী ঐতিহাসিক উমা চক্রবর্তীর ভাষায়, "ব্রাহ্মণ্যবাদী পিতৃতন্ত্র নারীর যৌনতাকে যেভাবে নিয়ন্ত্রণ করেছে এবং বিশুদ্ধ রক্তের উত্তরাধিকারীর উপর জোর দিয়েছে সেটাকে আমরা জেনেটিক ইঞ্জিনীয়ারিং এর আদিম রূপ বলতে পারি। উচ্চ নীচ নির্বিশেষে সব জাতির মধ্যে এই প্রথা এমন ভাবে টিকে থেকেছে যে আইনের বদল বা উদারনৈতিক মতবাদ কিছুই এটাকে ভাঙতে পারে নি। সবচেয়ে দুঃখের বিষয় হল, নিম্নবর্ণগুলোও কঠোরভাবে নারীর যৌনতাকে নিয়ন্ত্রণ করে। এটা করে তারা বহুবিবাহ ঠেকানোর জন্য কিন্তু তারা বোঝে না যে এর ফলে তারা যে ব্যবস্থার দ্বারা নিপীড়িত হয় সেই ব্যবস্থাকেই শক্তিশালী করে"।[১]

দলিত নারী ও ভারতীয় দৃশ্যপট :

স্বাধীন ভারতের সংবিধানে নারীদের সমানাধিকারকে মৌলিক অধিকারের স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল। এবং নারীদের জন্য সদর্থক বৈষম্যের নীতি গ্রহণ করতে রাষ্ট্রকে ক্ষমতা দিয়েছিল। সংবিধান নারীদের আইনের চোখে সমানাধিকার, সরকারি চাকরিতে সমান সুযোগ ও অন্যান্য সরকারি জীবনে বৈষম্যের বিলোপের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। আম্বেদকর যখন হিন্দু কোড বিল পাস করার চেষ্টা করেছিলেন, তখন কংগ্রেসের মধ্যেকার রক্ষণশীলদের, হিন্দু মহাসভার এবং জাতিসংঘের বিরোধীতার জন্য তা পাস করতে সক্ষম হননি। এই কোড বিলে নারীদের অবস্থা উন্নত করার কথা বলা হয়েছিল। কিন্তু পঞ্চাশের দশকে পাস হওয়া কিছু আইনে হিন্দু ব্যক্তিগত আইনে বড় রকমের পরিবর্তন করা হয়। এবং সম্পত্তি, উত্তরাধিকার ও বিবাহ সংক্রান্ত অধিকারে নারীদের অবস্থার উন্নতি হয়। এগুলো হল দি হিন্দু ম্যরেজ এ্যাক্ট, দি হিন্দু সাকসেসান এ্যাক্ট, দি হিন্দু এডপশান ও মেইনটেনান্স এ্যাক্ট এবং দি হিন্দু মাইনরিটি এ্যান্ড গার্ডিয়ানশিপ এ্যাক্ট।

কিন্তু এতসব কার্যকলাপ থাকা সত্ত্বেও দলিত নারীরা সেই নীচেই পড়ে আছে। নারীবাদ বা দলিত আন্দোলনের তত্ত্ব কোনও কিছুই তাদের মানবাধিকারের উপর অবিরাম চলা আক্রমণের মোকাবিলা করতে পারে নি। তারা দলিত এবং একই সঙ্গে নারী। নারী হিসেবে তাদের দলিত পুরুষদের তুলনায় নিকৃষ্ট বিবেচনা করা হয় এবং মনে হয় দলিত আন্দোলনকারীরা তাদের সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামায় না। অন্যদিকে, তারা দলিত বলেই নারীবাদী আন্দোলনকারীরা নারী আন্দোলনের মধ্যে তাদের যথাযথ স্থান দেয় না। ভারতে নারী আন্দোলন সচেতনভাবে অচেতনভাবে, অ-দলিত বর্ণহিন্দু নারীদের ঘিরেই গড়ে উঠেছে এবং তাদের সমস্যার প্রতি দৃষ্টি কেন্দ্রীভূত করেছে। আসলে বাস্তবতা এই যে, "উচ্চবর্ণ নারীদের সামাজিক মর্যাদা কখনোই দলিত পুরুষ বা নারীদের মতো নিচু হয়নি। পিতৃতান্ত্রিকতা একই জাতি ভুক্তদের মধ্যে রয়েছে আবার ভিন্ন জাতি ভুক্তদের মধ্যেও তা ক্রিয়া করে। সেখানে ব্যক্তি জাতি-পরিচিতি একটা ভূমিকা পালন করে। যারা পার্থক্য নিয়ে রাজনীতি করে তাদের শুধু একধরণের পার্থক্য নিয়ে ভাবলে চলবে না বরং অন্যান্য ধরনের পার্থক্য নিয়েও ভাবতে হবে"।[২]

এটা স্বীকার করতে হবে যে দলিত নারীদের সমস্যা নিয়ে আলাদা করে ভাবতে হবে কেননা তারা বহুস্তরীয় সমস্যার স্বীকার। তারা নারী বলে বৈষম্যের শিকার (লিঙ্গ-ভিত্তিক বৈষম্য), তারা দলিত বৈষম্যের শিকার (জাতি-ভিত্তিক)। ভারতে লিঙ্গ-ভিত্তিক ও জাতি-ভিত্তিক বৈষম্য সবচেয়ে খারাপ রূপে

দলিত নারীদের ক্ষেত্রে ঘটে। বিভিন্ন স্তরে এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে তারা আক্রমণের শিকার হয়। উচ্চবর্ণের পুরুষদের দ্বারা তারা অতি সহজেই যৌন হেনস্থার শিকার হয়। তাদের উপর যৌননিপীড়নকে ধর্মীয় আচারের আবরণ দিয়ে 'দেবদাসী' ও 'যোগিন' বানানো হয়। শিক্ষার অভাব, অর্থনৈতিক বঞ্চনা এবং তীব্র বেকারত্বের ফলে তারা আক্রমণের শিকার সহজ লক্ষ্যে পরিণত হয়।

দলিত নারীদের শ্রমকে অদক্ষ শ্রম হিসবে ছাপ মারা হয়। এবং সেজন্য তাদের কোনও স্বীকৃতি নেই। ফলে তারা কম বেতন পায় অথবা বিনা বেতনে কাজ করতে হয়। "ভারতবর্ষের প্রায় ৮৫ শতাংশ দলিত নারী কৃষিক্ষেত্রে কাজ করে। এটি হল একটি অসংগঠিত ক্ষেত্র যেখানে সংগঠিত ক্ষেত্রের মতো কোন সামাজিক নিরাপত্তা যেমন- মাতৃত্বকালীন সুবিধা বা চিকিৎসার সুবিধা নেই। দলিত মায়েরা মাঠে কাজ করার সময় তাদের বাচ্চাদের সঙ্গে নিয়ে যায় এবং সেখানে বাচ্চাদের রাখার কোনও সুবিধা নেই। অনেক সময় তাদের বাচ্চাদের সঙ্গে নেওয়ার অনুমতি দেওয়া হয় না এবং এজন্য অনেকে কাজও হারায়। জমির যে পাট্টা দেওয়া হয় সেটাও দলিত নারীদের নামে কমই দেওয়া হয়"।[৩]

শহরাঞ্চলের ক্ষেত্রেও দেখা যায় বেশিরভাগ দলিত মেয়েরা প্রধানত অসংগঠিত ক্ষেত্রে কাজ করে। তারা হকার, বর্জ্য কুড়ানেওয়ালা, ছোট ব্যবসায়ী ও গৃহস্থালির চাকরের কাজ করে। অথবা তারা নির্মাণ শিল্পে, বিড়ি তৈরিতে, মোমবাতি তৈরি, পোষাক ও জরি শিল্পে কাজ করে। কিছু ক্ষেত্রে দলিত নারীরা মলমূত্র পরিস্কার করার কাজ করে। নিজেদের স্বাস্থ্যের প্রতি কোন নজর না দিয়েই তাদের এটা করতে হয় এবং কখনও কখনও একটা রুটির বিনিময়ে তারা ঐ কাজ। এইসব ক্ষেত্রেই মজুরি অত্যন্ত কম, কাজ অনিয়মিত, সামাজিক নিরাপত্তার অভাব, যৌন হয়রানি এবং সর্বোপরি মালিক ও দালালদের মর্জি মাফিক তাদের কাজ জোটে। সম্পদের মালিকানার উপর ভিত্তি করে যে সামাজিক প্রাধান্য চলে তা বিভিন্ন জাতির আচারগত মর্যাদার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। নিম্নবর্ণের নারীরা যে উচ্চবর্ণের জমি মালিকদের দ্বারা নিগৃহীত হচ্ছে সেটা প্রায়শই দেখা যায়। যৌন নির্যাতন ও ধর্ষণকে ক্ষমতাশালীরা নিজের ক্ষমতার প্রকাশ হিসাবে দেখে। নিম্নবর্ণের পুরুষেরা এই অত্যাচারকে ঠেকাতে পারে না কারণ অত্যাচারীরা উচ্চবর্ণের ও ধনী। তাছাড়া বহু ক্ষেত্রে এই ধরনের দমনকে নিঃশব্দে মেনে নেওয়া বা স্বীকৃতি দেওয়া হয়। এটা ধরে নেওয়া হয় যে উচ্চবর্ণ ধনীদের এগুলো করার অধিকার রয়েছে। উত্তর প্রদেশে একটি চালু কথা আছে যা দিয়ে পরিস্থিতিটা বোঝা যায়। "মালিক যেমন খুশি তার ছাগলের দুধ দুইতে পারে,

তেমনি এক চামার নারীকেও যখন খুশি ভোগ করা যেতে পারে"।[৪] বিদর্ভ এলাকায় কুনবি জমিদাররা মাহার স্ত্রীলোকদের উপর যৌন নির্যাতন করে এবং বলে যে- "ওদের কিছু শস্য দিয়ে দাও, তাহলেও তারা চুপ করে থাকবে"।[৫] মোটামুটিভাবে এই হল ভারতবর্ষের দলিত নারীদের সামাজিক চিত্র। এবার আসা যাক মূল আলোচনায়। বাংলা আত্মকথার আলোকে এই দলিত নারীদের অবস্থান ঠিক কেমন? দলিত নারীদের আত্মকথাগুলিতে আসলে কীভাবে তারা নিজেদেরকে এবং নিজের গোষ্ঠীকে সমাজের মূলস্রোতে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেছেন ? এবং কীভাবে তারা ভিন্ন ফর্মে Human Experiences'কে পুনরায় উপস্থাপনের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন স্মৃতিকথা গুলিতে।

ভারতের নিম্নবর্গীয় সমাজে রয়েছে চারিদিকে প্রবল অসন্তোষ। সভ্য ও নাগরিক জীবনের তঞ্চকতা সরল ও পবিত্র মনের মানুষদের কখনোই ছোঁয় না। নিম্নবর্ণীয় সমাজ বৃত্তের কেন্দ্রবিন্দুতে থাকা নারীরাই নিয়ন্ত্রন করেন সবকিছুর গতি। বাঁচার সংগ্রামে সহনশীল এবং শক্ত মনের মানুষ তারা। 'নুন আনতে পান্তা ফুরানো গল্প' গ্রন্থনায় তাঁরা নতুনত্বের স্বাদ খুঁজে পান না। এগল্পের বিষয় তাদের কাছে নতুন নয়, চির পুরাতন। অনাদিকালের এক কাহিনীকথা।

নারীবাদী লেখিকা সিমোন দ্য বোভোয়া (১৯০৮-১৯৮৫) কোন একসময় নারীর সামাজিক অবস্থান বোঝাতে বলেছিলেন, নারী হল আপেক্ষিক জীব। অর্থাৎ পুরুষের উপর নির্ভরশীলা। বহু হাজার বছর ধরে, শ্রেণীভিত্তিক ও লিঙ্গভিত্তিক সমাজের সূচনা থেকে, এমনটা হয়ে এসেছে। আধুনিক যুগে বলতে গেলে, বিংশ শতাব্দীতে এসে এর কিছুটা পরিবর্তন হয়েছে, অন্তত কাগজে কলমে। তারপরও অবগুণ্ঠনের অন্তরাল থেকে উঠে এসেছে ব্যাতিক্রমী কিছু নারীমুখ। যারা সমাজের সর্বত্রই হীনতার স্বীকার। যারা অপাংক্তেয়। আমার এই অধ্যায়ে আলোচনার কেন্দ্রে রয়েছে তেমনই কয়েকজন দলিত নারীর আত্মজীবনী। এই আলোচনায় একদিকে যেমন নারীর আত্মকথা অন্যদিকে তাঁদের বিবর্তন বা পরিবর্তনের ইতিকথা বা ব্যতিক্রমের ব্যাখ্যা উঠে এসেছে। কেবল তাই নয় সমাজচিত্রও প্রতিফলিত হয়েছে সামগ্রিকভাবে।

নারীর রচনা বিভিন্ন দেশে ইতিহাসের মুল্যবান উপাদানরূপে গণ্য হয়েছে। ভারতের প্রথম মুঘল সম্রাট বাবরের কন্যা গুল দেন বানুর লেখা সমসাময়িক ইতিহাস, সে যুগের অনেক ক্ষেত্রে আলোকপাত করেছে। পরিচয় দিয়েছে একটি রুচিশীল বিদগ্ধ মনেরও। সপ্তদশ শতাব্দীতে ইংল্যান্ডে লুসি হাচিনসনের

আত্মজীবনী বা ডরোথি টেম্পসের পত্রগুচ্ছ গৃহযুদ্ধ বিদীর্ণ দেশ ও সমাজের ছবি তুলে ধরেছে। ফ্রান্সের মিলে দ্য সেভিগ্রে, লেডি মেরী সিমোন দ্য বোভোয়ার পাঁচখন্ড আত্মজীবনী সমসাময়িক ফ্রান্স ও ইউরোপের অমূল্য ইতিবৃত্ত। ওয়ার্টনো মন্টাগু প্রমুখ মহিলার পত্রাবলী ছিল সে সময়ের দর্পণ। কোনও কোনও সমালোচক মনে করেছেন আত্মকথা, পত্রাবলী ইত্যাদির মাধ্যমে ইউরোপীয়ান উপন্যাসের গোড়াপত্তন হয়েছিল। কারণ উপন্যাসের সাধারণ বিষয়বস্তু বলে যা মনে করা হয়, সংসারের খুঁটিনাটি, পরিবারের অভ্যন্তরে সম্পর্কের টানাপোড়েন, তা আসলে মেয়েলি ব্যাপার বলে গণ্য হত। বাংলা ভাষাতেও নারীর আত্মজীবনীর, আংশিক বা পূর্ণাঙ্গ, কোনো অভাব নেই। তবে এই আলোচনায় আমি মূলত এমন কয়েকজন নারীর কথা আলোচনা করব, যারা আসলে সমাজের ভিন্ন মেরুর অধিবাসী।

যখন ভারতবর্ষে নিম্ন মেধা ও মননশীলতার দোহাই দিয়ে নারীদের শিক্ষাদীক্ষায় বঞ্চিত করে রাখা হত, তখন পূর্ব বাংলার রামদিয়া নামক অঞ্চলের এক গ্রামীণ মহিলা রাসসুন্দরী দেবী ১৮৬৫-১৮৬৮ সালে নিজের জীবনকে আশ্রয় করে লিখে ফেললেন আত্মজীবনী, 'আমার জীবন'। যা বাঙালি মেয়েদের মধ্যে প্রথম প্রয়াস এবং প্রথম আত্মজীবনী। বিষয়টা ছিল সব অর্থেই অভিনব। তথাকথিত উচ্চবর্গীয় সম্প্রদায়ের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে বিধবা রাসসুন্দরী দেবী তাঁর বাল্য বিবাহিত জীবন লিখেই থামলেন না। তিনি লিখে ফেললেন গ্রাম বাংলার সমাজ সমস্যা। সেই থেকে অনেকেই আত্মজীবনী লিখেছেন। কিন্তু রাসসুন্দরী পালটে দিলেন আমাদের ভাবনার অভিমুখ। তাঁরও আগে অষ্টাদশ শতাব্দীতে নমো সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে আত্মপ্রকাশ করলেন প্রথম বাঙালি মহিলা কবি সুলোচনা গাইন। তিনি লিখলেন গোপিনী কীর্তন কাব্য। সুলোচনা গাইন থাকতেন ময়মনসিংহ জেলায়। যা দীনেশ চন্দ্র সেন সংকলিত করলেন তাঁর ময়মনসিংহ গীতিকায়। সুলোচনা গাইন তাঁর আত্মপরিচয় প্রকাশ করলেন এভাবে-

'চণ্ডালিনী বলি প্রভু করিও না ঘৃণা।
কৃপা করে লহ তুমি দাসীর প্রার্থনা'।[৬]

সত্যই তো সম্পদ স্রষ্টাদের জীবনে কত ঘটনা, কত কথা যা কোনোভাবেই বিখ্যাত ব্যক্তিদের জীবনপঞ্জি থেকে কম বা ছোট নয়। তাদের কথা জমা আছে যুগ যুগান্তর ধরে। আফ্রো আমেরিকার ব্লাক প্যান্থার আন্দোলন ও তাদের সাহিত্য (Black Literature) সারা পৃথিবীর নিপীড়িত মানুষের সামনে ভাষার এক নতুন জগত খুলে দিল।[৭] কিন্তু তাদের জগতের সঙ্গে ভারতের প্রান্তিক মানুষের ভাষা ও অনুভূতির একটি

মৌলিক পার্থক্য আছে। আফ্রো-আমেরিকান কালো মানুষকে লুপ্ত ও হৃত পিতৃভূমির জন্য কাতর করে, যেহেতু তারা আফ্রিকা থেকে নির্বাসিত বা তাদের পূর্বপুরুষদের লুট করে ক্রীতদাস হিসেবে পরবাসে নেওয়া হয়েছিল। ভারতের প্রান্তিক মানুষজন নিজ বাসভূমিতে পরবাসী। স্বাভাবিকভাবেই বলতে শেখা প্রান্তজনের সাহিত্যের ভাষা ও আত্মজীবনীর কথনে অন্য স্বর ভেসে উঠবেই। রাসসুন্দরী দেবীর আত্মজীবনী লেখার দেড়শো বছর পরে দেখি বাংলায় আবার প্রান্তিক মানুষজনদের মধ্যে আত্মজীবনী লেখার একটি প্রবণতা এসেছে। দলিত সাহিত্য ও সামাজিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরা ইতিমধ্যে দশ বা তার অধিক আত্মজীবনী লিখে ফেলেছেন। এমন একটি প্রেক্ষাপটে যুক্ত হয়ে যায় নিম্নবর্গ থেকে উঠে আসা কল্যাণী ঠাকুরের আত্মজীবনী 'আমি কেন চাঁড়াল লিখি' যা আসলে অনেক অর্থেই অন্যদের থেকে ব্যতিক্রমী।

কল্যাণী ঠাকুর দলিত লেখিকা হিসাবে বাংলা সাহিত্যে একটি সুপরিচিত নাম। বইয়ের সংক্ষিপ্ত ভূমিকায় তিনি জানিয়েছেন, "আমার একটা শৈশব ছিল, কৈশোরও। যৌবন প্রায় টেরই পেলাম না"।[৮] আরও জানিয়েছেন, "কিছু অধ্যাপক অধ্যাপিকার অনুরোধেই তাঁর এই আত্মজীবনী লেখার জন্য কলম ধরা। তাঁরা আমাদের ধন্যবাদভাজন। নইলে আমরা এক অনন্য ও অমূল্য রচনাপাঠ থেকে বঞ্চিত হতাম"।[৯] কিন্তু আত্মজীবনীর এমন নামকরণ কেন? সম্পূর্ণ বইটি পড়া হলে এর উত্তর এমনি মিলে যায়।

নদীয়া জেলার বগুলায় ওপার বাংলার ছিন্নমূল এক দরিদ্র ও সমাজের অবহেলিত শ্রেণীর পরিবারে কল্যাণীর জন্ম। তাঁর শৈশব জুড়ে আছে সেখানকার মাঠ-ঘাট, পুকুর, বিল আর কত বিচিত্র মানুষজন, সেই ছোটবেলার হাজারো দুষ্টমি, ডানপিটেমি, সেই মাঠে-ঘাটে খেলে বেড়ানো, সাঁতার শেখা আর তারপর ঘণ্টার পর জলে কাটিয়ে চোখ লাল করে মায়ের বকুনির ভয়ে মামাবাড়িতে গিয়ে খেয়ে শুয়ে পড়া- সত্যি, গ্রাম্য শৈশবের কাছে শহুরে শৈশবকে একটু পানসেই মনে হয়। অথচ এইসবের মধ্যেও ছিল নিয়মিত স্কুলে যাওয়া ও প্রতিদিন বাড়িতে নিয়ম করে পড়তে বসা। এই গ্রন্থে উঠে এসেছে লেখিকার পরিবারের মানুষদের, বাল্যবন্ধুদের ও অন্যান্য আপনজনদের জীবনের নানা সংগ্রামের টুকরো টুকরো অথচ মর্মস্পর্শী বিবরণ। এই আত্মকথন শুধু লেখিকার একার নয়, ঐ সময়ে সেই গ্রামের চুল্টু, ছোট কুটি, অণিমা, করুণা ও আরও অনেকেরই জীবন কথন। কৈশোরে মাতৃবিয়োগের পর লেখিকার কঠিন জীবন

সংগ্রাম শুরু হয়। পরিবারের দুঃসময় ও তার সাথে বাবা ও বড়দি বিশেষ করে বড়দির অসুস্থতায় দঃসহনীয় প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও তাঁকে জীবনতরী বেয়ে চলতে হয়েছে। যৌবনের প্রারম্ভেই কর্মজীবনে প্রবেশ। তখন একদিকে থাকে উচ্চশিক্ষালাভের পঠন-পাঠন ও কর্মজীনের সামঞ্জস্য বজায় রাখার কঠিন প্রয়াস আর অন্যদিকে থাকে সমাজের তথাকথিত নিম্নবর্ণের মানুষ হওয়ার কারণে কর্মস্থলে বিভিন্ন অপমান ও হেনস্থার ঘটনা। এর উত্তর পাওয়া যায় লেখিকার একটি বক্তব্যে। যেমন-

> "My colleagues in office call me charal, chamar, dom. I have to listen to these insults every day"।[১০]

উক্ত ঘটনাগুলি এবং সেগুলির বর্ণনা প্রসঙ্গে লেখিকা কিছু বিষয়ে তাঁর মতামত ব্যক্ত করেছেন যা পাঠককে আয়নার সামনে দাঁড় করায়।

কৈশোরে ও যৌবনে লেখিকা বিভিন্ন হস্টেলে থেকেছেন। সেখানকার জীবনের কঠিন বাস্তব ও উপভোগ্য বিবরণ বইয়ে রয়েছে। কর্ম ক্ষেত্র থেকে শুরু করে আবাসিক স্থান পর্যন্ত নানান ক্ষেত্রে নারীদের অপমান ও হেনস্থার বিভিন্ন দিক নিয়ে তিনি আলোচনা করেছেন তাঁর এই গ্রন্থে। তিনি শোষণের বিরুদ্ধে দৃঢ়ভাবে দাঁড়ানোর জন্য এবং স্ত্রী-পুরুষের মর্যাদার উচ্চনীচ ধারণাকে চ্যালেঞ্জ করার জন্য নিম্নবর্ণের নারীদের তথা দলিত নারীদের আহ্বান জানিয়েছিলেন। এর প্রমাণ পাওয়া যায় লেখিকার 'নীড়' নামক পত্রিকা প্রকাশের মাধ্যমে। সমাজের বিভিন্ন স্থানে অপমানিত ও হেনস্থার শিকার নারীদের আত্মকথা নিয়েই এই পত্রিকা। নারীদের জন্য সতীত্বের আদর্শকে তিনি তীব্রভাবে আক্রমণ করেছিলেন। যেভাবে পুরুষদের বহুগামিতাকে স্বীকৃতি দেওয়া কিন্তু নারীদের অবৈধ সম্পর্ককে নিন্দা করা হয় লেখিকা তার কঠোর সমালোচনা করেছেন। তিনি দাবি করেছিলেন যে নারীদের নিজ পছন্দমতো যৌন-জীবন বেছে নেওয়ার, ভালোবাসার মানুষের সঙ্গে মিলিত হওয়ার, অর্থনৈতিক জীবনে আত্মনির্ভরশীল হওয়ার অধিকার রয়েছে।

লিলি হালদার : ভাঙা বেড়ার পাঁচালি

> "স্মৃতির পটে জীবনের ছবি কে আঁকিয়া যায় জানি না। কিন্তু যেই আঁকুক সে ছবিই আঁকে। অর্থাৎ, যাহা-কিছু ঘটিতেছে তাহার অবিকল নকল রাখিবার জন্য সে তুলি হাতে বসিয়া নাই। সে

আপনার অভিরুচি-অনুসারে কত কী বাদ দেয়, কত কী রাখে। কত বড়োকে ছোটো করে, ছোটোকে বড়ো করিয়া তোলে।...বস্তুত তাহার কাজই ছবি আঁকা, ইতিহাস লেখা নয়"।[১১]

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা জীবনস্মৃতির সূচনার অবিস্মরণীয় সেই পংক্তিকে স্মৃতির পর্দায় ফিরিয়ে আনে একটি গ্রন্থ যার নাম ভাঙা বেড়ার পাঁচালি। ভাঙা বেড়ার পাঁচালি নাম হলেও এই গ্রন্থটিকে আত্মজীবনী বলা যায় না। তবে স্মৃতিকথা বলাই অধিকতর সঙ্গত। জীবন অফুরান, জীবনের মূলে আছে এক অকারণ আনন্দ। তাই বোধ হয় আধপেটা অভুক্ত মানুষও হাসে। এত বিধিনিষেধ সত্ত্বেও মানুষের পাশে মানুষ দাঁড়ায়, ভুলে যায় জাতপাতের ব্যবধান। আসলে মানুষের সঙ্গে মানুষের আত্মীয়তা অনেক গভীরে প্রোথিত- সেই কাহিনীই উঠে এসেছে এই বইতে।

সভ্যতার অগ্রগতি যতই সামনের দিকে এগিয়ে চলতে থাকুক না কেন, ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থায় নিম্নবর্ণের নারীর অবস্থান সেকালেও ছিল যেমন স্থগিত স্বপ্নের জানালা হয়ে এবং একালেও তাঁদের অবস্থান থেকে যাচ্ছে সেখানেই। দলিত নারীদের সেকালের জীবনেও ছিল কঠিন বাস্তবতায় মিশে থাকা চলমানতা এবং একালেও সেই চলমানতায় পুষ্ট তাঁরা। ভারতীয় ঐতিহ্যের আকর গ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত 'রামায়ণ' ও 'মহাভারতের' মতো মহাকাব্যেও নিম্নবর্গীয় এই রমণীদের উপস্থিতি বিশেষভাবে লক্ষ্য করা গেছে। বর্তমান সমাজে নিম্নবর্ণের নারীদের যা কিছু সংকট তার সবটাই মূলত দারিদ্র থেকে উদ্ভূত। গৌরবময় ঐতিহ্য থাকা সত্ত্বেও ভদ্রসমাজ তথা বাবু সমাজে তাঁরা অসম্মানিত। আর্থিক সংকট, শিক্ষার সংকট, জীবন ও জীবিকার সংকটের নিষ্ঠুর চাকায় পিষ্ট হতে হতে পথ চলতে হয় তাঁদের। এছাড়াও রয়েছে লিঙ্গবৈষম্য।

প্রান্ত সমাজ, প্রান্তিক মানুষ, সমাজের প্রান্ত সীমায় বসবাস। তাই আবহমান থেকেই তাদের কপালে জোটে অবহেলা, লাঞ্ছনা, বঞ্চনা। সেই যন্ত্রণার আবহে বড়ো হয়ে ওঠা এক নারী হলেন লিলি হালদার। তাঁর লেখায় উঠে এসেছে একদিকে দলিত তথা নিম্নবর্গের সমাজে জন্মলাভের অভিশাপের চিত্র অন্যদিকে নারী হিসেবে সমাজের দলনের কথা। খুব ছোটবেলা থেকেই সমাজকে দেখার চোখ ছিল তাঁর খুব প্রখর। ছোটবেলাতেই ঘরের মধ্যে থেকে লিলি টের পেয়েছিলেন বাস্তুহারা নমশূদ্র মানুষের দুঃখকে। বিশেষ করে ১৯৬৫ সালের পর থেকে প্রচুর আত্মীয়স্বজন এসে আশ্রয় খুঁজেছিল তাঁদের কলকাতার বাড়িতে। ছোট বাড়ি বাবার নিম্ন আয়। নুন আনতে পান্তা ফুরোয়। সারা দিন-রাত ঘরের মধ্যে ঘড়ঘড়

করে ঘোরে সেলাই মেশিন। মা তাঁর সমস্ত সুখ আহ্লাদ বন্ধক রেখে সেলাই করে সংসার ও উদ্বাস্তু আত্মীয়স্বজনদের মুখে খাবার তুলে দেন। সারি সারি বিছানা পড়ে ঘরের মেঝেতে। ঘর থেকেই অনুভব করলেন ১৯৭১ সালে রিফিউজি মানুষের স্রোত। সেই স্রোত এখনও বন্ধ হয়নি। মরিচঝাঁপির কুখ্যাত প্রান্তজন গণহত্যার পরেও ওপার থেকে সংখ্যালঘু মানুষের আসা বন্ধ হয়নি। প্রায় এক কোটি উদ্বাস্তুর নাগরিকত্ব নেই। লিলি হালদার তাঁর লেখায় কাজেই তুলে ধরেছেন সেইসব মানুষের কথা। তিনি তাঁর 'ভাঙা বেড়ার পাঁচালী' আত্মকথায় তুলে ধরেছেন বাঙালির ছদ্মবেশী জাতপাতের চেহারা। যে জাতপাতের চেহারা অন্য প্রদেশের চেয়ে বাহ্যিকভাবে কম উগ্র কিন্তু বর্ণবাদী মানসিকতা সর্বত্র অত্যন্ত সংগঠিত।

লিলি হালদারের কর্ম জীবনে প্রবেশ রেলে চাকরি পাওয়ার সুবাদে। রেলে চাকরিরত অবস্থায় তাঁকে তপশিলি বলে পদে বাঁধা ও অপমানের সম্মুখীন হতে হয়েছে। যেমন কর্মজীবনের শুরুর দিনের অভিজ্ঞতায় তিনি লিখেছেন-

> আমাদের সঙ্গে আরও সাত/আটজনের পোস্টিং অর্ডার হয়েছিল, সবাইকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে। জিজ্ঞাসা করে জি.এম. অফিসে হাজির হলাম। সামনে যে বড়োবাবু বসেছিলেন, রাজেন মণ্ডল, তাঁর হাতে অর্ডার-টা দিলাম। তিনি কাগজটা নিয়ে আমাকে অফিসারের ঘরে নিয়ে গেলেন। মনে পড়ল বাবার কথা... মাথা নিচু করে চুপচাপ বসে থাকবে। রাজেনবাবু আমার পোস্টিং অর্ডার-টা অফিসারের হাতে দিতেই আমাকে জিজ্ঞেস করলেন যে, আমি কী পাশ করে এসেছি। বললাম- এম. এ. শুনে তড়াক করে চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে বললেন, টুকে পাশ করেছ? চাকরির প্রথম দিনে তাঁর কথা শুনে মাথা ঠিক রাখতে পারছিলাম না। সোজাসুজি তাঁর দিকে তাকিয়ে বলেছিলাম- 'না'। এইভাবে কর্মজীবনের সূচনা হল-।[১২]

তখন তিনি অনেক পরিণত। বুঝে গেছেন সংরক্ষিত পদে আসা কর্মচারীর পিছনে কোনো খুঁটি নেই। আছে অনন্ত খাদ। একটু বেখেয়াল হলেই পতন। তাই তিনি কর্মদক্ষতায় হয়ে উঠলেন প্রশাসনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। একা কুম্ভের মতো লড়াই করে আদায় করে নেন তাঁর পাপ্য প্রমোশন। তিনি প্রতিনিয়তই প্রান্তিক সমাজের সম্পদকেই তুলে ধরেছেন। তিনি কখনোই সমাজের বা ব্যক্তির দারিদ্র বিক্রি করেননি। আসলে সেটিই তো ঠিক ভারতে যা কিছু উজ্জ্বল ঐতিহ্য, সম্পদ সব কিছু সৃষ্টি করেছেন প্রান্তিক মানুষজন। লিলি হালদার বুঝেছিলেন মেধা দিয়ে মূলধারায় দাঁড়িয়েই সুচারুভাবে বৈষম্যের

বিরুদ্ধে বিকল্প স্বরে কথা বলতে হবে। ইতিহাস। বেদ, পুরাণ, কোরান বিনির্মাণ করে আবার নতুন করে লিখতে হবে।

রেলে চাকরির সূত্রে তিনি দেশের বহুস্থানে ঘুরেছেন, ফলে অসংখ্য ঘটনার বাস্তব সমাবেশ ঘটেছে তাঁর জীবনে। যেহেতু তাঁর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে প্রান্তিক সমাজের মানুষের অনুভূতির দৃষ্টিকোণ, তাই 'ভাঙা বেড়ার পাঁচালী' হয়ে দাঁড়িয়েছে সময়ের এবং নিম্নবর্গের এক অনবদ্য দলিল। গ্রন্তটিতে আগাগোড়া যে বিষয়গুলি উপস্থাপিত হয়েছে তার মধ্যে যেন শুধু এক তার-ছিঁড়ে যাওয়া হাহাকার ধ্বনি শুনতে পাই। অথবা শোনা যায় সেই অমোঘ উচ্চারণ "ভাসান, ভাসান সারা বেলা"। স্মৃতির দ্যুতিতে এইসব চরিত-কথা গ্রন্থটিকে আগাগোড়া সমৃদ্ধ করেছে। কখনও উদারতায়, কখনও সংস্কার-মুক্তির আলোয়, কখনও অন্ধ প্রেমের উন্মাদনায়, আবার কখনও বড়ো বেদনায়। ভাষার নিরাভরণতা, কাব্যিক উপমা-অলঙ্কারের সম্পূর্ণ অনুপস্থিতি, জায়গায় জায়গায় নিরাবরণ স্বীকারোক্তি মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর My Early Life কে মনে পড়ায়। আর বার বার চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় সমাজের শূণ্যগর্ভ সংস্কারের অর্থহীনতাকে। তা সে বিধবা বিবাহের বেলাতেই হোক, হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ছোঁয়াছুঁয়ির বিচারেই হোক, বা সামাজিক বয়কটের ঘটনাতেই হোক।

দলিত নারীবাদী অন্দোলনের উত্থান :

বর্তমানে ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে দলিত নারীদের সংগঠন সমুহ গড়ে উঠতে শুরু করলেও তা ব্যপকভাবে নয়। দলিত নারী আন্দোলনের শক্তিবৃদ্ধি এবং দলিত নারীদের অধিকারকে বাড়িয়ে তোলার জন্য তাঁদের সংগ্রামকে সম্প্রসারিত করা আবশ্যিক। এই প্রসঙ্গে যে বিষয়গুলির প্রতি দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন সেগুলি নিম্নরূপ-

১) দলিত নারীদের সমস্যাকে সামনে নিয়ে আসার জন্য দলিতদের দাবি তথা নারীদের দাবিগুলোকে সামনে আনা প্রয়োজন।

২) ভারতে নারীদের শোষণ কিভাবে চিরাচরিত ধ্যানধারণার সঙ্গে যুক্ত এবং কিভাবে জাতি পরিচয়ের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত সেটা স্পষ্টভাবে দেখানো প্রয়োজন। ব্রাহ্মণ্যবাদের মূল অনুসন্ধান করা প্রয়োজন এবং দলিত নারীদের বিদ্যমান সমালোচনার পুনর্মূল্যায়ন করা প্রয়োজন।

৩) নারী আন্দোলনের তত্ত্বকে বিকশিত করার জন্য দলিত নারীবাদীদের বিদ্যমান নারী-আন্দোলনের বিভিন্ন উৎস থেকে (যেমন- মার্কসীয় নারীবাদ ইকো-নারীবাদ, কৃষ্ণাঙ্গ নারীবাদ) সাহায্য নিতে হবে। উৎপাদন সম্পর্কের মধ্যে কিভাবে নারীরা শোষিত হয় সেটা বোঝার জন্য মার্কসীয় নারীবাদী আলোচনা সহায়ক হতে পারে। পরিবেশ রক্ষা এবং দলিত নারীদের সমস্যার আভ্যন্তরীণ সম্পর্ক বুঝতে ইকো-নারীবাদ সাহায্য করতে পারে। কৃষ্ণাঙ্গ নারীবাদী তত্ত্ব থেকে দলিত নারীরা তাঁদের নিজেদের আন্দোলনের জন্য প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশ পেতে পারে।

উপরিউক্ত ক্ষেত্রগুলোতে দলিত নারীদের অধিকার আদায়ের জন্য গঠিত সংগঠনগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেন। কেননা উপরে উল্লেখিত দলিত নারীদের লেখা আত্মজীবনীগুলির আলোচনা থেকে যে চিত্র উঠে এসেছে তাতে বাংলা সাহিত্যে আত্মজীবনীর ঘরানায় এইসব দলিত নারীদের লেখা আত্মজীবনীগুলি এক ভিন্ন দ্যোতনা সৃষ্টি করেছে।

তথ্যসূত্র:

১. উমা চক্রবর্তী, জেন্ডারিং কাস্ট : থ্রু এ ফেমিনিস্ট লেন্স, কলকাতা : স্ত্রী পাবলিকেশান, ২০০৩ পৃষ্ঠা- ৩৬

২. তদেব.

৩. বেলা মালিক, "আনটাচেবিলিটি এ্যাণ্ড দলিত উইমেন অপ্রেসান", সম্পা. অনুপমা রাও, নিউ দিল্লি : ২০০৩, পৃষ্ঠা- ১০২

৪. লীলা দুবে, "কাস্ট এ্যাণ্ড উইমেন", সম্পা. অনুপমা রাও, পুর্বক্ত।

৫. তদেব.

৬. সুলোচনা গাইন, আত্মকথা।

৭ আফ্রো-আমেরিকার কালো মানুষের সাহিত্য ও ভারতীয় দলিত মানুষের সাহিত্যের মধ্যে প্রবল এক সাযুজ্য খুঁজে পাই আমরা। আফ্রো-আমেরিকার কালো মানুষের ইতিহাস মাত্র চারশ' বছরের। সপ্তদশ শতকের একেবারে প্রারম্ভকালে জঙ্গলময় আফ্রিকার অন্ধকারাচ্ছন্ন মহাদেশ থেকে কালো মানুষদের ক্রীতদাস হিসাবে আনয়ন করা হয়েছিল আমেরিকার সাদাদের দেশে। .

৮. কল্যাণী ঠাকুর, আমি কেন চাঁড়াল লিখি, কলকাতা : চতুর্থ দুনিয়া, প্রথম প্রকাশ, ভূমিকা অংশ, পৃষ্ঠা- ৩

৯. কল্যাণী ঠাকুর, আমি কেন চাঁড়াল লিখি, কলকাতা : চতুর্থ দুনিয়া, প্রথম প্রকাশ, ভূমিকা অংশ, পৃষ্ঠা- ৩

১০. কল্যাণী ঠাকুর, সাক্ষাৎকার, তারিখ-২৫-০৩-২০১৯, কলকাতা : মুকুন্দপুর, ৭০০০৯৯

১১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, জীবনস্মৃতি, কলকাতা : বিশ্বভারতী, ১৪২১

১২. লিলি হালদার, ভাঙা বেড়ার পাঁচালী, কলকাতা : পরম্পরা, জানুয়ারি, ২০১৯, পৃষ্ঠা- ১২৪,১২৫

১৩. ইলিয়র জেলিয়ট, "ড. আম্বেদকার এ্যাণ্ড দি এমপাওয়ারমেন্ট অফ উইমেন" সম্পা. অনুপমা রাও, পৃষ্ঠা- ২০৬.

উপসংহার

বাংলা সাহিত্যে আত্মজীবনীমূলক রচনা প্রচুর লেখা হলেও বিশেষ করে দলিত আত্মজীবনীতে স্বাভাবিকভাবেই দলিত জীবনের বিভিন্ন দিক উঠে এসেছে। এসেছে নরনারীর সম্পর্ক, গ্রামীণ জীবন চক্রে পিষে যাওয়া অস্তিত্বের হাহাকার, অপমান ও বর্বরতার অভিজ্ঞতা। আবার কখনো প্রতিরোধহীন শোচনীয় সমর্পণ, কখনো বা বিদ্রোহ। দলিত সাহিত্য চর্চার প্রায় তিন দশকেরও বেশি সময়কাল অতিক্রান্ত হয়েছে। অথচ দলিত সমাজের সংজ্ঞায়ন, নিম্নবর্গের মানুষদের ইতিহাস, সমাজে তাঁদের অবস্থান ইত্যাদি বিষয়ে সকলেরই জ্ঞানের পরিধি খুব সীমিত। ভারতে সামাজিক স্তর-বিভাজনে সব থেকে বেশি আক্রান্ত এইসব অস্পৃশ্য, নিম্নবর্ণ বা দলিতরা। তাঁদের অধঃপতিত অস্তিত্ব, অন্যদের থেকে পৃথকীকরণ এছাড়াও জীবনের সব ক্ষেত্রে প্রান্তিক অবস্থার মধ্যে তারা তাঁদের বুনিয়াদী অধিকারগুলি থেকে বঞ্চিত। তাঁদের বেশির ভাগই এখনো জীবনধারণের নূন্যতম উপকরণগুলি পায় না। এই না পাওয়াটার ভিত্তি সমাজে ব্যক্তি হিসাবে তার অবস্থান নয়, বরং সে যে গোষ্ঠীতে জন্মেছে সেই গোষ্ঠীর সামাজিক অবস্থানকেই চিহ্নিত করে। উচ্চবর্গীয় মানসিকতা দিয়ে একেকটি বিষয় বিচার করলে অবস্থান যেখানে থাকে, দলিত দৃষ্টিকোণে বিচার্য হয়ে ঘটেছে তারই অবস্থান্তর। অতীতের যা কিছু এ পর্যন্ত ঐতিহ্য হয়ে ধারাবাহিকতার ভিতর দিয়ে বর্তমানে বা আধুনিকতায় পা রেখেছে, সময়ের সঙ্গে তা বিশালভাবে ওলটপালট হয়ে যাচ্ছে। দলিত দৃষ্টিকোণ আধুনিক বিচার বিবেচনা সম্পন্ন মানুষের মনে পুরাতনে ও আধুনিকে সৃজন করেছে এক নতুন টানাপোড়েন। ভারতীয় সমাজ-চেতনায় এবং সাহিত্য সংস্কৃতিতে এটা সমকালের উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ‘মিথ’ ভেঙে এক নতুন মিথ, নতুন বিশ্বাস, নতুন উত্তরাধিকার তৈরি হচ্ছে এই ভারতবর্ষে, এই বাংলায়। এই অবদানের ধারক ও বাহক তথাকথিত যাঁরা সবার পিছে এবং নীচে।

সামাজিক অত্যাচার, শোষণ, ঘৃণা ও বঞ্চনার প্রতিরোধ সংগ্রামে দলিত সাহিত্য আজ একটি শক্তিশালী হাতিয়ার। এতে মিশে আছে আত্ম-পরিচয় এবং আত্ম-আবিষ্কার। আত্ম-পরিচয়ে রয়েছে ঘৃণা ও গ্লানির যন্ত্রণা- আত্ম-আবিষ্কারে রয়েছে শ্লাঘা ও গৌরব। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করব চতুর্থ দুনিয়া পত্রিকা থেকে সংগৃহীত অপূর্ব বাউড়ীর কবিতার কয়েকটি কবিতার পংক্তি-

আমি হেঁটে হেঁটে খুঁজছি উত্তর পুরুষের মুখ

জন্মের পর মাকে কখনো দেখিনি

জন্মের পর কে যেন শুনিয়েছিল ভিখিরির গান

তাকেও কখনো দেখিনি

তবু বহমান মানুষের ভিড়ে আকুল হয়ে খুঁজেছে পরিচিত মুখ

পাইনি, কাউকে খুঁজে পাইনি

শোন, এইখানে রেখে গেলাম তোমাদের লুপ্ত ইতিহাস।

ইতিহাস খুঁজতে খুঁজতে তারা খুঁজে পেয়ে যান তাঁদের বঞ্চনার ইতিবৃত্ত। এবং তার থেকে মুক্তির পথ কোথায় তাও খুঁজতে হয় তাঁদের। জীবন-দৃষ্টির গভীরতা কিংবা প্রজ্ঞাশীলিত প্রতিভার পরিচয় দারুণভাবে কিছু না থাকলেও সামাজিক দিক থেকে এটি আত্মোন্নয়নের বড় প্রয়োজনের বিষয়। মুক্তির পথ খুঁজতে খুঁজতে এইসব সর্বহারা দরিদ্র মানুষেরা কখনও পায়ে হাঁটেন, কখনও বা চড়েন কারো নৌকায়। কখনও আবার এক নৌকা থেকে ওঠেন আর এক নৌকায়। আর সেজন্যই আক্ষেপের সুরে তাঁদের কণ্ঠে ভেসে ওঠে আর কতকাল মোট বেয়ে বেড়াব মাথায়, কতকাল রিক্সা টেনে টেনে দেহ নিংড়ে রক্ত জল করে তোমাদের পৌঁছে দেব স্বর্গ-সীমানায়? মূলত এই গবেষণা পত্রে সেই বিষাদময় আক্ষেপের কারণ খুঁজতে গিয়ে যে বিষয়গুলি উঠে এসেছে তার পাশাপাশি দলিত লেখক তথা দলিত সমাজের আরও অনেক বিষয় রয়েছে যেগুলি সম্পর্কে ভারতীয় সমাজ এবং সেই সমাজের অধিবাসী মানুষেরা পুরোপুরি অবগত নয়। যেমন দলিত সমাজের মানুষের কাছে 'বিশ্বায়ন' কি? দলিত সমস্যায় দেশভাগের প্রভাব কতটা? তাছাড়া দলিত সংগঠন তথা মানবাধিকার সংগঠনগুলো দলিত নারীদের ওপর কতটা ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে সেটাও ভাবনার বিষয় হতে পারে। এই সকল বৃহত্তর যুক্তির বেড়াজালে আমার এই গবেষণা সন্দর্ভের আলোকে পরবর্তী গবেষণায় তুলে ধরার চেষ্টা করবো।

গ্রন্থপঞ্জি

(বর্ণানুক্রমিক)

- কুমার, রাণা. *সাঁওতাল পরগণার বারোমাস্যা.* কলকাতা: মুদ্রক ক্যাম্প, ২০০২.
- ঘোষ, নির্মলকুমার. *নকশালবাদী আন্দোলন ও বাংলা সাহিত্য.* কলকাতা: করুণা প্রকাশনী, ২০০০.
- ঘোষ, প্রদ্যোত. *বাংলার জনজাতি (১ম খণ্ড).* কলকাতা: পুস্তক বিপণি, ২০০৭.
- ঘোষ, ঋষিপ্রতিম. *তিন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা সাহিত্যে সাঁওতাল জনগোষ্ঠী.* কলকাতা: পুস্তক বিপনি, ২০০২.
- চৌধুরি, অরুন. *আদিবাসী জীবন ও সংগ্রাম.* কলকাতা: গাঙচিল, ২০১৩.
- ঠাকুর, কল্যাণী. *চণ্ডালিনীর বিবৃতি১-.* কলকাতা: চতুর্থ দুনিয়া, ২০১২.
- ঠাকুর, কল্যাণী. *চণ্ডালিনী ফিরে এল উলঙ্গ হয়ে.* কলকাতা: প্রত্যুষ পাবলিকেশন, ১৪২১.
- দেবসেন, সুবোধ. *বাংলা কথাসাহিত্যে ব্রাত্য সমাজ.* কলকাতা: পুস্তক বিপণি, ১৯৯৯.
- দোহা, এম, এস. *বাংলদেশের আদিবাসী সমাজের ইতিবৃত.* ঢাকা: অরকিড, ২০০৫.
- পাল, মধুময় (সম্পাদিত). *মরিচঝাঁপি ছিন্ন দেশ, ভিন্ন ইতিহাস.* কলকাতা: গাঙচিল, ১৪১৬.
- প্রামানিক, মৃন্ময়. *দলিত নন্দনতত্ত্ব শরণকুমার লিম্বালে (অনুবাদ).* কলকাতা: তৃতীয় পরিসর, ২০০৭.

- বন্দ্যোপাধ্যায়, সনৎকুমার. *তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত জীবনী: তারাশঙ্কর রচনাবলী (প্রথম খণ্ড).*
- বন্দ্যোপাধ্যায়, সন্দীপ. *দলিতের পুরান কথা.* কলকাতা : অনুষ্টুপ, ২০০৫.
- বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকুমার. *'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা'* কলকাতা: মডার্ন বুক এজেন্সি, পুনমুদ্রণ ২০১০-২০১১।
- বালা, যতীন. *শিকড়ছেঁড়া জীবন: উদবাস্তুদলিতের দলিল-.* কলকাতা : গাঙচিল, ২০১৮.
- ব্যাপারী, মনোরঞ্জন. *ইতিবৃত্তে চণ্ডাল জীবন.* কলকাতা : দেজ পাবলিশিং, ২০১৬.
- বিশ্বাস, *মনোহরমৌলি. দলিত সাহিত্যের রূপরেখা.* কলকাতা : বাণীশিল্প, ২০০৭.
- বিশ্বাস, মিল্টন. *তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটোগল্পে নিম্নবর্গের মানুষ.* ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০০৯.
- বিশ্বাস, মনোহর. *ভিন্নচোখে প্রবন্ধমালা.* কলকাতা: চতুর্থ দুনিয়া, ২০০৩.
- বিশ্বাস, মনোহরমৌলি. *আমার ভুবনে আমি বেঁচে থাকি.* কলকাতা : চতুর্থ দুনিয়া, ২০১৩.
- বিশ্বাস, মনোহরমৌলি. *দেশভাগ ও বিশ্বায়ন : পরাজিত মানুষের গল্প.* কলকাতা : চতুর্থ দুনিয়া, ২০১৮.
- বিশ্বাস, মনোহরমৌলি. *অস্পৃশ্যের ডাইরি.* কলকাতা : চতুর্থ দুনিয়া, ২০১০.
- ভদ্র, গৌতম. ও পার্থ চট্টোপাধ্যায়, (সম্পা:). *নিম্ন বর্গের ইতিহাস.* কলকাতা : আনন্দ, ১৯৯৮.
- ভট্টাচার্য, দেবাশিস. *বিশ শতকের বাংলার কথা সাহিত্যে নিম্নবর্গীয় চেতনা.* ত্রিপুরা: অক্ষর পাবলিকেশনস, ২০০২.

- ভট্টাচার্য, তাপস. *বাংলা উপন্যাসে উদ্বাস্তু জীবন.* কলকাতা : পুস্তক, ১৪১১ বঙ্গাব্দ.
- ভট্টাচার্য, দিনেন. *কাঙাল হরিনাথ.* কলকাতা : অভিযান পাবলিশার্স, ২০১৯.
- মজুমদার, দিব্যজ্যোতি. *আদিবাসী মিথ কথা.* কলকাতা : পরম্পরা পাবলিকেশন, ২০১৩.
- মণ্ডল, চিত্ত. *বাংলার দলিত আন্দোলনের ইতিবৃত্ত.* কলকাতা : অন্নপূর্ণা প্রকাশনী, ২০০৩.
- মণ্ডল, চিত্ত. ও প্রথমা, রায়মণ্ডল. *বাংলার দলিত আন্দোলনের ইতিবৃত্ত.* কলকাতা : একুশ শতক, ২০১৬ .
- মজুমদার, সমরেশ. *শৈলজানন্দের গল্পে নিম্নবর্গীয় চরিত্রের আখ্যান.* কলকাতা : শুভশ্রী (পত্রিকা), ২০০৭.
- মল্লবর্মণ, অদ্বৈত. *তিতাস একটি নদীর নাম.* কলকাতা : দেজ পাবলিশিং, ২০১৮.
- মল্লিক, দীপঙ্কর. *সৃষ্টির বহুস্বর : জিজ্ঞাসুর দৃষ্টিতে.* কলকাতা: দেজ পাবলিশিং, ২০০৯.
- মুখপাধ্যায়, ধ্রুবকুমার. *তারাশঙ্কর: সমকাল ও উত্তরকালের দৃষ্টিতে.* কলকাতা: রত্নাবলী, ১৯৯৯.
- মুখোপাধ্যায়, জগমোহন. *'গবেষণা পত্র অনুসন্ধান ও রচনা',* কলকাতা: আনন্দ, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০১২
- সিংহ, অসিত. *বাংলা উপন্যাসে সমাজ চিন্তার বিবর্তন (১৯৫০-১৯০০).* কলকাতা: গ্রন্থমেলা প্রা: লি:, ১৯৮৩.
- রায়, দেবেশ. *দলিত.* দিল্লি: সাহিত্য আকাদেমি, ২০০৪.
- রাণা, সন্তোষ, ও কুমার, রাণা. *পশ্চিমবঙ্গে দলিত ও আদিবাসী.* কলকাতা: ক্যাম্প, ২০০৯ .
- রাণা, সন্তোষ. *সমাজ শ্রেণী রাজনীতি.* কলকাতা: ক্যাম্প, ২০০৬.
- সাহা, দেবকুমার. *সতীনাথ ভাদুড়ী উপন্যাসের নির্মাণশিল্পি.* কলকাতা: বাণী আর্ট প্রেস, ২০১২.

- সেনমজুমদার, জহর. *নিম্নবর্গের বিশ্বায়ন.* কলকাতা: পুস্তক বিপণী, ২০০৭.
- সেন, নবেন্দু. *আখ্যান: নির্মাণে-বিনির্মাণে.* কলকাতা: রত্নাবলি, ২০০৬.
- সেন, শুচিব্রত. *পূর্বভারতে আদিবাসী অস্তিত্বের সংকট.* কলকাতা: দেজ পাবলিশিং, ২০০৩.
- সেন, সুকুমার. *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস(পঞ্চম খণ্ড).* কলকাতা: আনন্দ পাবলিশিং, ২০১০.
- সিকদার, সুনন্দা. *দয়াময়ীর কথা.* কলকাতা: গাংচিল, ২০১৬.
- সিংহ, অসিত. *বাংলা উপন্যাসে সমাজ চিন্তার বিবর্তন(১৯৫০-১৯০০).* কলকাতা: গ্রন্থমেলা প্রা: লি:, ১৯৮৩.
- সুর, নিখিল. *ছিয়াত্তরের মন্নন্তরসন্ন্যাসী ফকির বিদ্রোহ-.* কলকাতা: সুবর্ণরেখা, ১৯৮২.
- সুর, অতুল. *ভারতের নৃতাত্ত্বিক পরিচয়.* কলকাতা: সাহিত্যলোক, ২০০১.
- হান্টার, ডবলিউ ডবলিউ. *গ্রাম বাংলার ইতিকথা.* কলকাতা: সুবর্ণরেখা প্রকাশনি, ১৯৮৪.
- সিংহ, অসিত. *বাংলা উপন্যাসে সমাজ চিন্তার বিবর্তন (১৯৫০-১৯০০).* কলকাতা: গ্রন্থমেলা প্রা: লি:, ১৯৮৩.
- হক, আনারুল. *বাংলাদেশের হরিজন ও দলিত জনগোষ্ঠী.* কলকাতা: জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ২০১৬.
- হালদার, লিলি. *ভাঙা বেড়ার পাঁচালি.* কলকাতা: পরম্পরা, ২০১৯.
- হোসেন, সেলিনা. *'নারী বিশ্ব'* (সম্পাদনা বরেন্দু মণ্ডল), কলকাতা: অভিযান পাবলিশার্স, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০১৯.

- Biswas, monoharmouli. *An Interpretations of Dalit literature asthetic theory and movements: Through the lens of ambedkarism.* Kolkata: Chaturtha Dunia, 2017.
- Prasher-sen, Aloka. *Subordinate and Marginal Groups in Early India* (Delhi: Oxford University Press, 2004)